বাভারিয়ার রহস্যময় দুর্গ

শাহরিয়ার কবির

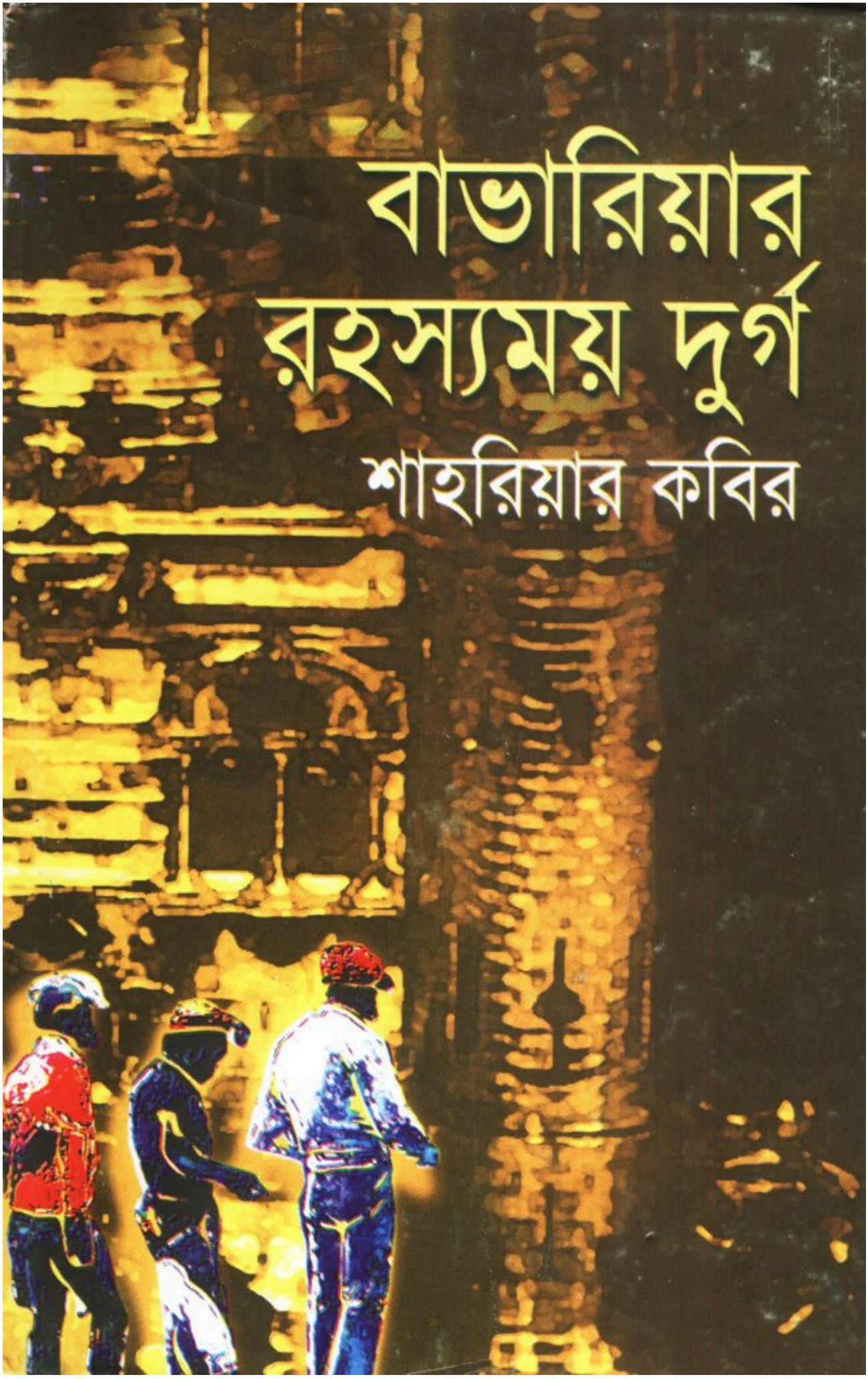

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

বাভারিয়ার রহস্যময় দুর্গ

শাহরিয়ার কবির

স্ক্যানিং এবং এডিটিং - মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ

Website – Banglapdf.net

বাভারিয়ার রহস্যময় দুর্গ

শাহরিয়ার কবির

শব্দশৈলী

বাভারিয়ার রহস্যময় দুর্গ

শাহরিয়ার কবির

গ্রন্থস্বত্ব : অর্পণ শাহরিয়ার

শব্দশৈলী প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ২০০৮

দ্বিতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০০৯

প্রকাশক : ইফতেখার আমিন
শব্দশৈলী
৩৮/৪, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৭১২২৫৪৯৯৭

প্রুফ সংশোধন : সত্যপ্রকাশ মিত্র

বর্ণবিন্যাস : সাব্বির কম্পিউটার

মুদ্রণ : সুপারগ্রীন প্রেস

প্রচ্ছদ : মোবারক হোসেন লিটন

মূল্য : একশত দশ টাকা মাত্র

একমাত্র পরিবেশক : মনন প্রকাশ

ISBN : 984-70189-0007-3

BAVARIAR RAHASHYAMOY DURGO : Juvenile novel By Shahriar Kabir; Published By Iftekhar Amin; Shobdoshoily, 38/4, Banglabazar, Dhaka-1100.
E-mail : shobdoshaily@yahoo.com.
Published Febuary 2008, Price : Tk. 110.00

উ ৎ স র্গ

ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল

বীর প্রতীক

লেখকের কথা

'৮৯ সালের অক্টোবরে জার্মানি গিয়েছিলাম। তখনও বার্লিনের দেয়াল ভাঙা হয়নি, দুই জার্মানিও এক হয়নি। তবে পূর্ব জার্মানির লোকজনরা সুযোগ পেলেই পশ্চিমে পালিয়ে যাচ্ছিল। সরাসরি যেতে অসুবিধে, তাই ওরা পালাতো চেকোশ্লোভাবকিয়ার সীমান্ত দিয়ে। জার্মান—চেক সীমান্তেই বাভারিয়া আর বোহেমিয়ার চমৎকার ঢেউ খেলানো পাহাড়, ফার, বার্চ, পাইনের বন, ছোট বড় রূপোলি হ্রদ, সরু সরু ইল্‌য, ইশার আর ডানিউব নদী—সব মিলিয়ে এক অপরূপ ছবি, দেয়ালে বাঁধাই করে রাখার মতো।

পূর্ব জার্মানি থেকে পশ্চিমে এসে দেখি সমাজতন্ত্রের পতন হচ্ছে বলে লোকজনের ভারি উল্লাস। নব্য নাৎসিরাও এ সুযোগে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। হিটলারের পুরোনো নাৎসিদের আদলেই গড়া, বিদেশীদের বিরুদ্ধে কড়া কড়া কথা বলছে। জার্মানিতে বাঙালির সংখ্যা কম নয়। নব্য নাৎসিদের উৎপাতে তারা খুব শংকিত। অনেকেই গেছে ৭৫—এর পর, এখানে জাসদ করতো, কর্ণেল তাহেরের ফাঁসি হওয়ার পর দলে দলে পালিয়েছিল জার্মানিতে। কেউ কেউ সেখানে বিয়ে থা করে থিতু হয়ে বসেছিল যদিও সবার মন পড়ে থাকতো বাংলাদেশে। এরই পটভূমিতে লেখা হয়েছে। *বাভারিয়ার রহস্যময় দুর্গ।*

জার্মানির অনেক জায়গায় গেলেও বাভারিয়ায় তখন আমার যাওয়া হয়নি। অথচ কাহিনীর ঘটনা এমনই যে, বাভারিয়া ছাড়া অন্য কোথাও ঘটালে চলবে না। বাভারিয়া সম্পর্কে জানার জন্য ঢাকার জার্মান কালচারাল সেন্টারের পরিচালক মিসেস লেশনারের শরণাপণ্ন হতে হয়েছিল। এই অমায়িক ভদ্রমহিলা পরিচয় করিয়ে দিলেন ওঁদের লাইব্রেরিয়ান মিসেস হোসেনের সঙ্গে। জার্মান ভাষা জানা মিসেস হোসেন লাইব্রেরি থেকে বই আর ভিডিও ক্যাসেট জোগাড় করে দিয়ে, বই—ক্যাসেটে যেসব তথ্য পাইনি সেগুলো অন্যভাবে সংগ্রহ করে কম উপকার করেননি। কিছু তথ্য জার্মান প্রবাসী শরাফ আহমেদের কাছ থেকেও নিয়েছি। এ সুযোগে এঁদেরে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জার্মানিতে ছিলাম অফেনবাখের জাহাঙ্গীরের বাসায়। সেও জাসদ করতো, রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে এখনও জার্মানিতে আছে। জাহাঙ্গীর আর ওর বন্ধুদের একটাই ভয়—নব্যনাৎসিদের উৎপাতে ওদের কখন আবার জার্মানি ছাড়তে হয়! জার্মানির পটভূমিতে লিখতে গিয়ে ওদের কথাও মনে পড়ছে।

শা. ক.

মে ১৯৯৭

আকাশের দিকে তাকিয়ে বুড়ো ওক গাছের তলায় শুয়েছিল স্বপন। গাছের পাতার ফাঁকে চকচকে নীল টুকরো টুকরো আকাশ দেখা যাচ্ছিলো। দুপুরের মৃদু বাতাসে শীতের নরম আমেজ। মধ্য ইউরোপে এখন পাতা ঝরার সময়। বাভারিয়ার বনে কালচে ঘনসবুজ পাইন গাছের ফাঁকে ফাঁকে ওক, লিন্ডেন, বার্চ, পপলার আর চেস্টনাট গাছে নানা রঙের মেলা। সেপ্টেম্বর শেষ হতে চলেছে। বাভারিয়া আর বোহেমিয়ার বনে আরও কিছু দিন থাকবে রঙের এই সমারোহ।

টুপ করে একটা গাঢ় লাল ওক পাতা খসে পড়লো স্বপনের বুকের ওপর। পাশে বাবা বসে বিচিত্রা পত্রিকা পড়ছেন। দেশের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ এই মাধ্যমে রয়েছে। চিঠি লেখার কথা মনে হলে রাজ্যের আলসেমি পেয়ে বসে তাঁকে। সময় মতো চিঠির উত্তর দেন না বলে ঢাকার বন্ধুরা তাঁকে কদাচিৎ লেখেন। বড় এক ভাই আছেন বটে, গত দু' বছরের কোনো চিঠি লেখেননি।

স্বপন লক্ষ্য করলো পত্রিকায় কী একটা লেখা পড়ে বাবা উদাস হয়ে গেলেন। অল্প দূরে মা আর ওর ছোট বোন শীলা চা বানাবার আয়োজন করছে। আজ শনিবার, ওদের ছুটির দিন। প্রায় প্রত্যেক শনিবারে ওদের ডেগেনডর্ফের বাড়ি থেকে তিন মাইল দূরে ডানিউব নদীর তীরে বনের ভেতর এই বিশেষ জায়গায় পিকনিক করতে আসে ওরা। এ ছাড়া ওদের ছোট্ট শহরটায় যাবার তেমন কোনো জায়গা নেই।

স্বপনের মা জার্মান। এখান থেকে তিরিশ মাইল দূরে রেগেনবার্গে ওর নানার বাড়ি। নানা নানি যখন বেঁচেছিলেন তখন ওরা ওখানে যেতো বেড়াতে। দু'বছর হলো নানা নানি দু'জনই মারা গেছেন। বাড়িতে এখন এক কেয়ারটেকার থাকে। স্বপনরা গত দু' বছরে মাত্র তিনবার গেছে নানার বাড়ির অবস্থা দেখতে।

বাবাকে উদাস হয়ে বসে থাকতে দেখে স্বপন জানতে চাইলো, 'তুমি কী ভাবছো বাবা?

'কী আর ভাববো!' বলতে গিয়ে হালকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বাবা।

'তুমি দেশের কথা ভাবছো।' কথাটা স্বপন এমনভাবে বললো যেন ও বাবার মনের সব খবর রাখে।

বাবা স্বপনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। কোনো কথা বললেন না। ছেলের মুখের আদল ওঁর মতোই, তবে গায়ের রঙ পেয়েছে মায়ের। মাত্র তের বছরে পা রেখেছে, অথচ দেখলে মনে হয় ওর বয়স পনেরো ষোলর কম নয়। স্কুলে পড়াশোনার চেয়ে খেলাধুলোর দিকে ওর ঝোঁক বেশি। এ বয়সেই স্কুলের ফুটবল টিমে চান্স পেয়ে গেছে। শীলা হয়েছে স্বপনের ঠিক উল্টো। গায়ের রঙ বাবার মতো শ্যামলা, চেহারা মা'র সঙ্গেই বেশি মিল, মায়ের মতো শান্ত স্বভাবের, ক্লাসে পড়াশোনায় সব সময়ে ওপরের দিকে থাকে।

স্বপন বললো, 'বাবা, তুমি কি আজ আমাদের দেশের কথা বলবে?'

স্বপনের জন্ম হয়েছে জার্মানিতে। কোনোদিন বাংলাদেশে আসেনি। বাবার কাছে অবশ্য বাংলা বলা শিখেছে, কিছু পড়তেও পারে, তবে লেখার ব্যাপারে ওর কোনো আগ্রহ নেই। অথচ স্কুলে জার্মান ছাড়া ও ফ্রেঞ্চ আর ইংলিশ দুটোই শিখছে। শীলা বয়সে ওর এক বছরের ছোট হলেও বাংলা খানিকটা লিখতে পারে, শেখারও আগ্রহ আছে। ওদের মা জার্মান, জন্মেছে জার্মানিতে, তবু ওরা দুজনই নিজের দেশ ভাবে বাংলাদেশকে। মাঝে মাঝে ওরা বাবার কাছে বাংলাদেশের কথা জানতে চায়।

ওদের বাবা শফিক খান দেশ ছেড়েছেন চৌদ্দ বছর আগে। ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। বলতে গেলে পালিয়ে এসেছেন দেশ থেকে। না পালালে তাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হতো, নয়তো যাবজ্জীবন জেল খাটতে হতো।

স্বপনের মা ওদের জন্য চা বানিয়ে আনলেন। বড় একটা চাদর পাতা ছিল গাছের নিচে। স্বপন শুয়েছিল এক কিনারে। মা এসে বাবার পাশে বসলেন। মা'র সঙ্গে শীলাও উঠে এসেছে।

চা খেতে খেতে স্বপন আবার বললো, 'বলো না বাবা আমাদের দেশের কথা!'

বাবা মুখ ফিরিয়ে মা'র দিকে তাকালেন। তারপর আবার স্বপনকে দেখলেন। একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমি তো বলেছি, এটাই তোমাদের দেশ। তোমরা এদেশের নাগরিক।'

'এদেশের নাগরিক হতে পারি, কিন্তু এটা আমাদের দেশ নয় বাবা। আমাদের ফাদারল্যান্ড হচ্ছে বাংলাদেশ।'

স্বপন জার্মানদের মতো নিজের দেশকে মাতৃভূমি বলে না, বলে পিতৃভূমি। বাবা বললেন, 'তুমি কথাও বলো জার্মানদের মতো। বাঙালিরা কখনও ফাদারল্যান্ড বলে না।'

শীলা একটু হেসে বললো, 'আমাদের মাদারল্যান্ড জার্মানি, ফাদারল্যান্ড বাংলাদেশ।'

মা মৃদু হেসে বাবার দিকে তাকালেন—'শীলা ঠিক বলেছে। ওরা যদি ওদের ফাদারল্যান্ড সম্পর্কে জানতে চায় তুমি আপত্তি করতে পারো না শফিক।'

বাবা নিচু গলায় বললেন, 'তুমি তো জানো ইভা, সে সব কথা আমি মনে করতে চাই না। কষ্ট হয় ভাবলে।'

'একা কতকাল এই কষ্ট বয়ে বেড়াবে। ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে। তোমার কষ্টের ভাগ ওদেরও নিতে দাও।' মা'র গলাটা নরম জেরানিয়াম ফুলের মতো।

বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেন নদীর দিকে মুখ করে। বিকেলের সোনাগলা রোদে ঝলমল করছে নীল ডানিউব নদী আর গাঢ় সবুজ বাভারিয়ার বন। একটা সীগাল একা উড়ে বেড়াচ্ছে ডানিউবের ওপর। মাঝে মাঝে আর্ত গলায় সঙ্গীকে ডাকছে। কে জানে কোন নিষ্ঠুর শিকারি ওকে সঙ্গীহারা করেছে। নদীর তীরে চকচকে সবুজ ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে তারার মতো ছোট ছোট হলুদ ডেইজি ফুল ফুটেছে। নানা রঙের প্রজাপতি ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে।

বাবা আপন মনে বললেন, 'তোমাদের আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধের কথা বলেছি।'

'বলেছো বাবা।' শীলা বললো, 'তুমিও স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিলে।'

'যুদ্ধের পর বাড়ি ফিরে দেখি পাকিস্তানী সৈন্যরা আমাদের পুরো গ্রামটা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। আমার বাবাকে ওরা গুলি করে মেরেছে।'

'তোমার মা কোথায় ছিলেন?' জানতে চাইলো শীলা।

'মা আমাদের ছোটবেলায় মারা গেছেন। আমরা দু'ভাইই যুদ্ধে গিয়েছিলোম। বড় ভাই আমার ছ'বছরের বড়। যুদ্ধের আগে তিনি চাকরিতে ঢুকেছিলেন। আমি তখন কলেজে। যুদ্ধের পর ভাই হলেন আমার অভিভাবক। এক বছর পর আমি ইউনিভার্সিটিতে ঢুকলাম। আর তখনই রাজনীতির সঙ্গে পুরোপুরি জড়িয়ে গেলাম।'

স্বপন বললো, 'ইউনিভার্সিটি শেষ না করে তুমি রাজনীতিতে জড়ালে কেন?'

'দেশের খারাপ অবস্থা দেখে। যে আশা নিয়ে যুদ্ধ করেছিলাম, ভেবেছিলাম দেশ স্বাধীন হলে সে আশা পূরণ হবে। আমরা যুদ্ধ করেছিলাম পাকিস্তানী শাসকদের শোষণ আর বঞ্চনার কবল থেকে বাঁচার জন্য। ভেবেছিলাম দেশ স্বাধীন হলে কোনোরকম শোষণ পীড়ন থাকবে না। কিন্তু কিছুই হলো না। সব কিছু আগের মতোই চলছিল। বরং যারা গরিব ছিল তারা আরও গরিব হতে লাগলো। জিনিসপত্রের দাম বাড়তে লাগলো। দেখে মনে হলো এ অবস্থা চলতে দেয়া যায় না। তাই রাজনীতিতে জড়ালাম।'

মা বললেন, 'বড় রকমের যুদ্ধের পর সব দেশের অবস্থাই খারাপ থাকে। বাবা মা'র কাছে শুনেছি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানিতে বহু লোক খেতে না পেয়ে মারা গেছে। ছবিতে নিশ্চয় দেখেছো আমাদের গোটা দেশটাই ছিল একটা ধ্বংসস্তুপ।'

বাবা বললেন, 'আমাদের অবস্থা অবশ্য জার্মানির মতো খারাপ ছিল না। তবু চুয়াত্তর সালে হাজার হাজার মানুষ না খেতে পেয়ে মরে গেছে।'

'তোমার দলের নাম কী ছিল বাবা?' জানতে চাইলো স্বপন।

'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল। আমরা সংক্ষেপে বলি জাসদ। সেই দলের ছাত্র সংগঠনে কাজ করতাম আমি। সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বার ছিলাম।'

'হিটলারের পার্টির নামও তো জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল! তোমরা কি নাৎসিদের সমর্থন করো?'

'কক্ষণো নয়।' বাবা একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমরা মার্কসবাদে বিশ্বাস করতাম। বাংলাদেশে আমরা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম।'

'খুব বড় দল ছিল তোমাদেরটা।'

'মোটামুটি বড়ই বলতে পারো। সরকার বিরোধী দলগুলোর ভেতর তখন অন্যদের তুলনায় আমাদের শক্তিই বেশি ছিল। সরকারের দুর্নীতি আর নানা রকম অনিয়মের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্যে আমাদের বহু কর্মীকে গ্রেফতার করে জেলে ঢোকানো হয়েছিল। সরকারি বাহিনীর গুলি খেয়ে মারাও গেছে অনেকে।'

'কী সাংঘাতিক।' আঁতকে উঠলো শীলা—'তার মানে তুমিও মারা যেতে পারতে?'

'আমিও মারা যেতে পারতাম।' একটু থেমে বাবা আবার বললেন, 'আমাদের মতো দেশে রাজনীতি করতে হলে সব সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়েই করতে হয়। সরকারি দলেরও অনেক কর্মী তখন বিরোধী দলের কর্মীদের হাতে মারা পড়েছে।'

'বলো কী বাবা!' অবাক হয়ে স্বপন উঠে বসলো—'এখনও কি বাংলাদেশের অবস্থা ভালো হয়নি?

'এখানকার অবস্থা আগের চেয়ে অনেক বেশি খারাপ। মানুষের জীবনের কোনো দামই এখন নেই। কলেজ ইউনিভার্সিটিতে ছেলে মেয়েদের পাঠিয়ে বাবা মা ভয়ে ভয়ে থাকেন—ওরা জীবিত ফিরে আসবে না লাশ হয়ে ফিরবে।'

'তোমাকে দেশ ছাড়তে হলো কেন সে কথা বলো।'

'পঁচাত্তর সালের অগাস্টে আমাদের দেশে একটা সামরিক অভ্যুত্থান হলো। কয়েকজন আর্মি অফিসার প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবকে গুলি করে মেরে ফেললো। তাঁর তিন ছেলে আর স্ত্রীকেও তারা হত্যা করেছিল।'

মা বললেন 'তুমি না বলেছিলে শেখ মুজিবের ডাকে তোমরা স্বাধীনতার যুদ্ধে গিয়েছো?'

'তা তো গিয়েছিলাম। তাঁর মতো নেতা বাংলাদেশে আর কখনও আসেনি। কিন্তু দেশ চালাতে গিয়ে তিনিও অনেক ভুল করেছিলেন।'

'তাই বলে তাঁকে গুলি করে মেরে ফেলতে হবে? তোমরা কি তাই চেয়েছিলে?

'না, আমরা তা চাইনি। আমরা রাজনৈতিকভাবে তাঁর বিরোধিতা করেছি। রাজনৈতিকভাবেই আমরা সরকারের পরিবর্তন চেয়েছিলাম। তাঁকে মেরে যারা ক্ষমতায় বসলো তারা অনেক বেশি খারাপ ছিল। নভেম্বরে আমরা তাদের বিরুদ্ধে একটা অভ্যুত্থান করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেটা ব্যর্থ হয়। আমাদের নেতারা সবাই ধরা পড়ে গেলেন। বহু কর্মীকে গ্রেফতার করা হলো। অত্যাচারের পাহাড় নেমে এল আমাদের ওপর।' বলতে গিয়ে বাবার মুখে বিষাদের নীল ছায়া ঘনিয়ে এল। 'এ অভ্যুত্থানের প্রধান নায়ক ছিলেন কর্ণেল তাহের। আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধের অসম্ভব সাহসী একজন অধিনায়ক ছিলেন। যুদ্ধে তিনি একটা পা হারিয়েছিলেন। আমি তাঁর সেক্রেটারির কাজ করতাম। তিনি জেলে যাওয়ার আগেই আমাকে বলেছিলেন যেভাবে পারি আমি যেন দেশ ছেড়ে চলে যাই। তোমাদের মা ইভা ছিল আমার পেনফ্রেন্ড। কলেজে থাকতেই চিঠিতে ওর সঙ্গে পরিচয় আর বন্ধুত্ব হয়েছিল। একদিন আমাদের

বাড়িতে পুলিশ এল আমার খোঁজে। তার দু'দিন পরই আমি দেশ ছাড়ি। জার্মানিতে এসে রাজনৈতিক আশ্রয় নিই। তখন আমাদের দলের অনেকেই জার্মানি এসেছিল। এখানে আসার সাতদিন পরই তোমাদের মাকে বিয়ে করি।'

'তোমাদের নেতা কর্ণেল তাহেরের কী হলো?' প্রশ্ন করলো স্বপন।

'তাঁকে জেলের ভেতর বিচারের একটা প্রহসন করে ফাঁসি দেয়া হয়েছিল।' বলতে গিয়ে রাগে বাবার চোয়াল শক্ত হয়ে গেল—'পরে তাহেরের হত্যাকারী প্রেসিডেন্ট জিয়াকে তাঁর নিজের সৈন্যরাই গুলী করে মেরেছিল।'

'তোমারা বড় ভাই'র কথা বলেছিলে। তিনিও কি রাজনীতি করতেন? প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য প্রশ্ন করলো শীলা।

'না, কখনও রাজনীতির ধারে কাছেও তিনি আসেন নি। বরং আমার রাজনীতি করার ব্যাপারে তাঁর খুবই আপত্তি ছিল। শেষের দিকে আমার সঙ্গে কথা বলাই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তবু তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তিনি না থাকলে আমার লেখাপড়া হতো না। জার্মানিতে আসার টিকেট আর অন্য সব ব্যবস্থা তিনিই করে দিয়েছিলেন। তবে এখানে আমার বিয়ে করাটা তিনি মেনে নিতে পারেননি। গত দু' বছর তাঁর কোনো চিঠিও পাইনি।'

মা বললেন, 'তুমি কিন্তু কয়েক বার তাঁকে টাকা পাঠিয়েছো।'

'তা পাঠিয়েছি। বিয়ে করেছেন বাহাত্তরে। ছেলেমেয়ে চারটা। তাঁর অবস্থা বেশি ভালো হওয়ার কথা নয়। অবশ্য টাকার জন্য তিনি কখনও আমাকে লেখেননি।'

'তুমি ইচ্ছে করলে তোমার ভাইয়ের ছেলেমেয়েদের এখানে আসতে বলতে পারো, যদি ওদের উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রয়োজন হয়।'

'বলতে পারি। মনে হয় না ভাই ওদের কাউকে আমার কাছে পাঠাবেন।'

'এর কারণ কি তুমি বিদেশী বিয়ে করেছো বলে?'

একটু বিব্রত হয়ে বাবা বললেন, 'অনেকটা তাই।'

'তোমরা বিদেশীদের এত ঘৃণা করো কেন?'

'ঘৃণা নয় ইভা, বলতে পারো রক্ষণশীলতা। আমাদের সমাজটা খুবই পিছিয়ে পড়া—মধ্যযুগে এখানে যেমন ছিল।'

স্বপন বললো, 'মাম, জার্মানরাও কিন্তু বিদেশীদের পছন্দ করে না।'

'সব জার্মানরা নয়, নাৎসিরা পছন্দ করে না। তোমরা খুব ভালো করেই জানো নাৎসিদের আমি কী রকম ঘৃণা করি।'

'নাৎসিদের আমরাও ঘৃণা করি। কিন্তু মাম ওদের শক্তি দিন দিন বাড়ছে।'

'সে জন্য আমার আরও বেশি রাগ হয়।'

বাবা ম্লান হেসে বললেন, 'তোমাদের দেশে নাৎসিদের শক্তি বাড়ছে, আমাদের দেশে ওদের দোসর জামাতীদের শক্তি বাড়ছে। সারা পৃথিবী জুড়েই এসব অশুভ শক্তির প্রভাব দিন দিন বাড়ছে। অথচ সবাই চুপ করে আছে। খুবই ভয়ের কথা ইভা!'

মা বললেন, 'নাৎসিরা আর কত বাড়বে? জার্মানির মানুষ এখনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা ভুলে যায়নি।'

শীলা বললো, 'বাবা তুমি দেশের কথা বলতে গিয়ে নোংরা রাজনীতির ভেতর চলে এসেছো।'

'রাজনীতিতে ভালো মন্দ দুইই আছে শীলা।' বাবা বললেন, 'নোংরা রাজনীতির শিকার হয়ে আমাকে সুন্দর একটি দেশ ছেড়ে এখানে চলে আসতে হয়েছে।'

স্বপন বললো, 'জার্মানিও খুব সুন্দর দেশ বাবা।'

বাবা কোনো কথা বললেন না। আধাশোয়া হয়ে আনমনে বিচিত্রার পাতা ওল্টাতে লাগলেন। কোথাও দেশের কোনো খবর পড়লে ওর মন খারপ হয়ে যায়। সবুজ ঘাসের গালিচা পাতা উপত্যকায় পাহাড়ের ছায়া পড়েছে। রোদ উঠে গেছে পাহাড়ের ওপরের গাছের মাথায়। মা শীলাকে বললেন, 'জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। আমাদের যাবার সময় হয়েছে। তুমি কি আরেক কাপ চা খাবে শফিক?'

বাবা হাই তুলে বললেন, 'দিতে পারো।'

চায়ের প্রতি বাবার বিশেষ দুর্বলতার কথা স্বপন আর শীলাও জানে। ওরা বুঝলো একটু পরেই বাবার মন ভালো হয়ে যাবে। বাবা বিষণ্ন হলে ওদেরও মন খারাপ করে।

সন্ধ্যার দিকে সবাই জিনিসপত্র গুছিয়ে ওদের মস্ত বড় বিএমডব্লু গাড়ির পেছনে তুললো। বাবা ড্রাইভিং সিটে বসলেন। মা বসলেন তাঁর পাশে। পেছনের সিটে স্বপন আর শীলা। গাড়ি চালাতে চালাতে বাবা মাকে বললেন, 'এ জায়গাটা দারুণ দেখতে। একটা মোটেল খুলবে নাকি? জানাজানি হলে প্রচুর টুরিস্ট আসবে।'

মা হেসে বললেন, 'আমাদের যেটা আছে সেইটাই যথেষ্ট। টুরিস্টদের এ জায়গাটা চেনাতে চাই না। এটা একান্তভাবেই আমাদের থাকবে।'

স্বপন বললেন, 'আমাদের বন্ধুরা নিশ্চয় আসতে পারে?'

'পারে, যদি তারা এ জায়গার কথা আর কাউকে না বলে!'

শীলা হেসে বললো, 'এ্যানি যদি একবার এখানে আসে, স্কুল সুদ্ধো সবাইকে গল্প করবে।'

এ্যানি স্বপনের বন্ধু, একই ক্লাসে পড়ে। শীলার কথা শুনে স্বপনের রাগ হলো। বললো, 'কার্ল বুঝি এর কথা ওকে বলে বেড়ায় না?'

কার্ল শীলার বন্ধু, ওদের পাশের বাড়িতে থাকে। শীলা বললো, 'কার্লকে এখানে আনতে আমার বয়েই গেছে।'

ছেলেমেয়েদের খুনসুটি শুনে বাবা মা মৃদু হাসছিলেন। বন্ধুরা সবাই বলে ছেলে মেয়েদের চমৎকার লালন করছেন খান দম্পতি।

দূর থেকে ওদের বাড়ির সামনে, পাঁচটা গাড়ি দাঁড়ানো দেখে সবার মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। নামেই শুধু ওদের বাড়ি। আসলে ডেগেনডর্ফের সবচেয়ে বনেদি হোটেল এটা। বাভারিয়ার জাতীয় ফুল জেরানিয়ামের নামে এই হোটেলটা চল্লিশ বছর আগে বানিয়েছিলেন অস্ট্রিয়ার এক ভদ্রলোক। পরে তাঁর কাছ থেকে কিনেছিলেন স্বপনের নানা। একমাত্র মেয়ের বিয়ের পর জামাইকে এটা উপহার দিয়েছেন। মস্ত বড় তিনতলা কাঠের বাড়ি। ওপরে রান্নাঘর ছাড়া কামরা হচ্ছে পাঁচটা। দোতালায় আটটা আর নিচের তলায় চারটা কামরা আর বড় হলঘর। একতলা আর দোতালায় হোটেলের অতিথিরা থাকে, স্বপনরা থাকে তিন তলায়। দোতালায় ওঠার সিঁড়ি হলঘরের ভেতর দিয়ে, তেতালায় উঠতে হয় বাইরে দিয়ে।

টুরিস্ট সিজনে এক মাস আগে জেরানিয়ামের কামরা বুক করতে হয়। সেপ্টেম্বরের শেষে টুরিস্ট সিজন শেষ হয়ে যায়। অক্টোবরের বৃষ্টি, ঝড়ো ঠাণ্ডা বাতাস নভেম্বর পর্যন্ত গড়ায়। তারপর নামে বাভারিয়ার হাঁড় কাঁপানো শীত। এক রাতের বরফে সব কিছু সাদা হয়ে যায়। মার্চের শেষ থেকে বরফ গলতে আরম্ভ করে। পাহাড়ে পাহাড়ে বুনো টিউলিপ, জেরানিয়াম আর ডেইজির নানা রঙের মেলা বসে। জার্মানির সবচেয়ে সুন্দর আকাশ আর প্রকৃতি দেখার জন্য তখন ঝাঁকে ঝাঁকে আসে টুরিস্টরা।

গাড়ি সোজা গ্যারেজে তুলে দিয়ে বাবা বললেন, 'বেচারা টমাসের নিশ্চয় খুব ঝামেলা যাচ্ছে। আজ তো মার্থাও আসেনি।'

টমাস হচ্ছে জেরানিয়ামের ম্যানেজার। মার্থা বার—এ বসে। সব মিলিয়ে জেরানিয়ামের কর্মচারী আটজন। টমাস আর মার্থা ছাড়া ওয়েটার ওয়েট্রেস আছে চারজন, একজন বাবুর্চি, আরেকজন পাহারাদার। রান্নার কাজে স্বপনের

মা প্রায়ই বাবুর্চি গুস্তাভকে সাহায্য করেন। অতিথি বেশি হলে স্বপন আর শীলাও ওয়েটারের পোশাক পরে কাজে লেগে যায়। বাবা ক্যাশ সামলান।

স্বপনরা যা ভেবেছিল হল রুমে ঢুকে তাই দেখলো। এক কোণায় বার—এর সামনে জমজমাট আসর বসেছে। টমাস আর নোরা মগ ভর্তি বিয়ার দিতে দিতে হয়রান হয়ে যাচ্ছে। অন্য ওয়েটাররাও ব্যস্ত পায়ে টেবিল থেকে টেবিলে ছুটোছুটি করছে। জাপানি টুরিস্টদের একটা দল বসেছে বড় টেবিলে। ছেলে মেয়ে বুড়ো সব সুদ্ধো দশজন। কোনো টেবিলই খালি নেই। দরজার পাশের টেবিলে মাঝ বয়সী এক জোড়া দম্পতি লাল মদ আর মাংসের স্টেক নিয়ে বসেছে। যেভাবে জোরে জোরে কথা বলছিল দেখেই মনে হয় ইটালিয়ান। জার্মানদের মতো ওরা যখন তখন বিয়ার খায় না। ওদের পছন্দ লাল মদ।

স্বপন আর শীলা পিকনিকের জিনিসপত্র রাখতে ওপরে গেল। বাবা গেলেন ম্যানেজারের চেম্বারে আর ওদের মা গিয়ে ঢুকলেন রান্নাঘরে।

সিড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে শীলা বললো, 'গত কদিন টুরিস্ট না আসায় বাবার বেশ মন খারাপ ছিল।'

স্বপন হেসে বললো, 'আজ একদিনেই সব পুষিয়ে যাবে।'

ঠিক তখনই টেলিফোন বাজার শব্দ হলো। স্বপন এক বারে তিন সিড়ি টপকে দৌড়ে গিয়ে ফোন ধরলো।

কাঁধে একটা, হাতে আরেকটা ব্যাগ নিয়ে শীলা ধীরে সুস্থে ওপরে উঠে দেখলো বারান্দার এক কোণে রাখা টেলিফোনে কথা বলতে বলতে স্বপনের মুখ চকচক করছে। গলা তুলে জিজ্ঞেস করলো, 'কার টেলিফোন?'

রিসিভারে হাত চেপে স্বপন চেঁচিয়ে বললো, 'বন থেকে রনি টেলিফোন করেছে।' তারপর আবার ও কথা বলায় ব্যস্ত হয়ে গেল।

মৃদু হেসে নিজের ঘরে ঢুকে শীলা ব্যাগ দুটো নামিয়ে রেখে হাত পা ঝেড়ে বিছানায় গিয়ে বসলো। রনি যখন ফোন করেছে এক ঘন্টার আগে স্বপনের কথা শেষ হবে না।

বছর চারেক আগে বড়দিনের ছুটিতে রাজধানী শহর বন—এ বেড়াতে গিয়ে রনিদের সঙ্গে ওদের পরিচয় হয়েছে। রনির বাবা বাংলাদেশ এম্ব্যাসির কাউন্সিলার। বিজয় দিবসে এম্ব্যাসিতে অনুষ্ঠান হবে শুনে ওরা দেখতে গিয়েছিল। সেখানে পরিচয়ের সূত্রে জানা গেল কাউন্সিলার কুতুবউদ্দিন আহমেদ স্বপনের চাচার সঙ্গে এক স্কুলে পড়েছেন। ছোটবেলায় স্বপনের দাদার বাড়িতেও গেছেন। রনি স্বপনের চেয়ে বয়সে সামান্য বড় হবে। বন—এ আমেরিকান স্কুলে পড়ে ও। সেবার স্বপনরা উঠেছিল হোটেলে। পরদিন কাউন্সিলার কুতুবউদ্দিন, বড় মার্সেডিয এনে ওদের সবাইকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেছেন। রনির সঙ্গে স্বপনের বন্ধুত্ব হতে দেরি হয়নি। এরপর প্রতি শীতেই অন্য সব জায়গায় ঘুরতে গেলে স্বপনেরা এক ফাঁকে বন হয়ে আসে। স্বপনের বাবা অবশ্য প্রত্যেকবারই রনির বাবাকে বলেছেন ওদের ডেগেনডর্ফের বাড়িতে বেড়াতে আসতে। এম্ব্যাসির কাজে তিনি এত ব্যাস্ত থাকেন যে—দু'বার প্রোগ্রাম করেও আসতে পারেননি।

স্বপনের বন্ধু হলেও রনিকে শীলার ভালোই লাগে। স্বপনের মতো অতো লম্বা চওড়া নয় ও। হালকা পাতলা গড়ন, চোখে চশমা, চুলগুলো কোঁকড়া, দু'চোখে দুষ্টুমি ভরা, কথাও বলে খুব মজার। গত বার ওকে যখন শীলা নতুন

বছরের কার্ড পাঠালো, তার জবাবে রনি লিখেছিল, প্রতিবারই স্বপনের কার্ডের সঙ্গে তোমার কাছ থেকে একটা কার্ড পাবো আশা করি। এতদিনে সে আশা পূরণ হলো। আরও ভালো লাগতো খামটা যদি নীল হতো আর ভেতরে যদি দু লাইনের একটা চিঠি থাকতো। তাহলে এটুকু অন্তত বলতে পারতাম আমাকে চিঠি লেখার মতো একটা মেয়ে আছে। স্বপনের চিঠিতে ফুটবলের কচকচি পড়তে পড়তে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি।

জবাবে শীলা লিখেছিল, নতুন বছরে বন্ধুদের এত কার্ড পাঠাতে হয়—সবাইকে তার সঙ্গে চিঠি দিতে গেলে প্যাডের অর্ধেকটা শেষ হয়ে যাবে। খামের রঙের ব্যাপারে আমার কিছু করার ছিল না। দোকান থেকে কার্ডের সাথে রঙ মিলিয়ে খাম দিয়েছে। তাছাড়া বিশেষ কোনো রঙের প্রতি আমার তেমন পক্ষপাতিত্বও নেই।

এরপর রনি আর চিঠি লেখেনি। টেলিফোনে শীলাকে বলেছে, 'তুমি ক্রিস্টা উলফের উপন্যাস পড়ে পড়ে যে বখে যাচ্ছো এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

শীলা কোনো জুৎসই জবাব দিতে পারেনি। কারণ রনি মিথ্যে বলেনি। জার্মান লেখিকা ক্রিস্টা উলফের উপন্যাস পেলে ও গোগ্রাসে গেলে। না গেলার কোনো কারণও নেই। ওর বয়সী জার্মানির যে কোনো মেয়েই ক্রিস্টা উলফের নামে পাগল।

মিনিট পনেরো পরেই স্বপন গলা তুলে ডাকলো, 'শীলা' টেলিফোন ধরো। রনি তোমার সঙ্গে কথা বলবে।'

শীলা উঠে গিয়ে টেলিফোনে—'হ্যালো' বলতেই রনি ওপাশ থেকে খুশিভরা গলায় বললো, 'আমি তোমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসছি শীলা!'

'সত্যি বলছো তো? কবে আসবে?' আনন্দে ঝলমল করে উঠলো শীলার চেহারা।

'স্বপন তো বললো অক্টোবরে যেতে। তোমাদের বাভারিয়াতে নাকি অক্টোবর ফেস্টিভ্যাল হয় তখন? আর নাকি সব হাজার বছরের পুরোনো দুর্গ ছড়িয়ে আছে ওখানে?'

'শুধু কি পুরোনো! হরর ছবির স্যুটিং করার মতো রহস্যময় সব দুর্গ আছে বাভারিয়ায়। চলে এসো রনি। দারুণ মজা হবে।'

'হ্যাঁ, স্বপন বলেছে।'

'আসবে তো ঠিক! নাকি গতবারের মতো শেষ মুহূর্তে বাতিল করবে?'

'এবার আসবো। স্বপনকে বলেছি এবার না এলে আর কখনও আসা হবে না।'

'এ কথা কেন বলছো?'

'বাবার বদলির অর্ডার হয়ে গেছে। নভেম্বরে আমরা অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছি।'

'তোমাদের কী মজা রনি! কয়েক বছর পর পর এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে ঘুরছো।'

'মা যদি তোমার কথা শোনে এক্ষুণি চেঁচিয়ে হুলুস্থুল কাণ্ড বাঁধাবে!'

'কেন?'

মা বলেন, 'কোথাও শেকড় না গাড়তেই চলে যেতে হয়, এ কেমন জীবন! মা বরং তোমাদের মতো থাকতে পছন্দ করেন।'

'আমাদের তো শেকড়ই নেই।' ম্লান হেসে শীলা বললো, 'বাবা বলেন আমরা শেকড় ওপড়ানো মানুষ!'

'বলো কী শীলা! চোদ্দ বছর বাভারিয়ায় আছো, এখনও শেকড় গজালো না? ভয়ানক পাথুরে মাটি নাকি ওখানকার? গাছপালা কিছুই গজায় না?'

শীলা হেসে বলো, 'বাভারিয়ার মতো সবুজ জার্মানির আর কোথায় দেখতে পাবে না।'

'তোমার মার মতো শেকড় পেয়েও তোমার বাবা কী করে ভাবতে পারেন—তোমরা শেকড় ওপড়ানো মানুষ?'

'বাবা এখনও ভয়ানক মিস করেন নিজের দেশকে।'

'মাঝে মাঝে গেলেই পারো।'

'দেশে বাবার নামে হুলিয়া বেরিয়েছিল। গেলেই তাঁকে পুলিশে ধরবে।'

'কেন ধরবে? তোমার বাবা কী করেছেন?'

'তিনি রাজনীতি করতেন। বিকেলে বাবার কাছ থেকে শোনা কথাটা চেপে রাখতে পারলো না শীলা। বললো, 'বাবা একটা ব্যর্থ অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।'

'কোন অভ্যুত্থানের কথা বলছো?' বাইরে বাইরে থাকলেও দেশের সব খবরই রাখে রনি।

'যে অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কর্ণেল তাহের। তুমি কি তাঁর নাম শুনেছো?'

'কেন শুনবো না? তাঁর মতো বীর বাংলাদেশে খুব কমই জন্মেছেন।'

শীলা ভেবেছিল ওর বাবা রাজনীতি করতেন, ব্যর্থ অভ্যুত্থানে জড়িত ছিলেন, এসব শুনলে রনি একটু দমে যাবে। বাবার দলের নেতা সম্পর্কে রনির উঁচু ধারণার কথা জানতে পেরে ও খুশি হলো। বললো, 'তুমি আসছো কিভাবে রনি?'

'মিউনিখ পর্যন্ত প্লেনে। তারপর বাসে যাবো ভেবেছিলাম। স্বপন বললো, গাড়ি নিয়ে এয়ারপোর্টে নিতে আসবে। কী পাগলামি দেখ তো! এতদূর আসার কোনো দরকার ছিল না।'

'সেটা আমরা বুঝবো। তুমি টিকেট কেটেই ফোন করে ফ্লাইটের সময় জানিয়ে দিও।'

'ঠিক আছে শীলা। এখন রাখছি। রাতে আশা করি সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখবে।'

'গত দু রাত আমি স্বপ্নে দেখেছি একটা বাঁদর আমার পায়ের তলায় পাখির পালক দিয়ে কাতুকুতু দিচ্ছে।'

'ছেলে বাঁদর না মেয়ে বাঁদর?'

'তা কী করে বলবো?'

'নিশ্চয় ওটা মেয়ে বাঁদর। আজ তুমি অন্যরকম স্বপ্ন দেখবে।' বলে টেলিফোন রাখলো রনি।

স্বপন ততক্ষণে নিচে গিয়ে রনির আসার কথা বাবা মাকে জানিয়েছে। শীলা নিচে নেমে দেখলো এ্যাপ্রণ পরে স্বপন মহা উৎসাহে অতিথিদের খাবার পরিবেশন করার কাজে লেগে গেছে। ও রান্নাঘরে ঢুকে মাকে বললো, 'আমি কি তোমাকে কোনো কাজে সাহায্য করতে পারি মাম?'

মা মৃদু হেসে বললেন, 'হোয়াইট সসটা শেষ হয়ে গেছে। ইচ্ছে করলে খানিকটা বানাতে পারো।'

রান্নাঘরে মা'র সঙ্গে কাজ করতে শীলা খুবই পছন্দ করে। বললো, 'কতটুকু বানাবো মাম?'

'ছোট কাচের জারের মাপে করলেই হবে।' একটু থেমে মা মুখ টিপে হাসলেন—'রনি আসবে শুনে নিশ্চয় খুব খুশি হয়েছো?'

শীলা না বোঝার ভান করে বললো, 'হ্যাঁ মা, স্বপন খুব ফুর্তিতে আছে।'

রাতে খেতে বসে বাবা বললেন, 'কুতুব ভাইরা চলে যাবেন শুনে খারাপ লাগছে।'

মা বললেন, 'ওঁরা যখন আসতে পারবেন না, আমরাই না হয় এক উইকএ গিয়ে দেখা করে আসবো।'

স্বপন বললো, 'রনি বলেছে ও সাত দিন থাকবে। আমরা ওকে পৌঁছে দেয়ার উপলক্ষে যেতে পারি।'

শীলাও ওকে সমর্থন করলো—হ্যাঁ বাবা, খুব মজা হবে।

দু'দিন পর রনি টেলিফোন করে জানিয়েছিল অক্টোবরের এক তারিখ সকাল নটায় ও কেএলএম—এর ফ্লাইটে মিউনিখ আসছে। মা শুনে বললেন, 'ভালোই হলো। অনেকদিন মিউনিখের অক্টোবর ফেস্ট—এ যাই না। রনিকে আনার সুযোগে ফেস্টিভ্যাল দেখা হয়ে যাবে।'

প্রত্যেকে বছর মিউনিখের অক্টোবর ফেস্ট দেখার জন্য সারা ইউরোপ থেকে হাজার হাজর টুরিষ্ট আসে। পৌনে দুশ বছর আগে রাজা ম্যাক্স জোসেফ অক্টোবরের পয়লা তারিখে গোটা মিউনিখ শহরের বাসিন্দাদের নেমন্তন্ন করেছিলেন বাভারিয়ার যুবরাজ লুডভিগের সঙ্গে সাশেনের রাজকুমারী থেরেসার বিয়েতে। শহরতলীতে এই উৎসব এমনই জমেছিল যে কেউ সেটা ভুলতে পারলো না। রাজার রক্ষী বাহিনী ঘোষণা করলো, প্রতিবছর তারা অক্টোবরের পয়লা তারিখে এই উৎসব করবে। সেই থেকে শুরু। বাভারিয়ার মানুষ সারা বছর এই দিনটির অপেক্ষায় থাকে।

এক তারিখে অতি ভোরে স্বপনরা সবাই তৈরি হয়ে গেল মিউনিখ যাবার জন্য। বাভারিয়ার রাজধানী ওদের ছোট জনপদ ডেগেনডর্ফ থেকে গাড়িতে আড়াই ঘন্টার পথ। বাবা শুধু ফর্মাল স্যুট পরেছেন। মা পরেছেন বাভারিয়ার মেয়েদের সনাতন পোষাক লম্বা ঝুলওয়ালা প্রচুর লেসের কাজ করা দামী ভেলভেটের গাউন। স্বপন আর শীলাও বাভারিয়ার ঐতিহ্যবাহী পোষাক পরেছে। স্বপনের সাজ দেখে মা মন্তব্য করলেন, কোমরে একটা তলোয়ার ঝোলালে ওকে নাকি রাজকমার লুডভিগের মতো লাগবে।

শীলা মুখ টিপে হেসে বললো, 'আফসোস হচ্ছে আমাদের এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে। প্রিন্সেস এ্যানি আমাদের প্রিন্সকে দেখতে পেলো না।'

মা অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, 'প্রিন্সেস এ্যানি কে?'

'স্বপনদের স্কুলে পড়ে।'

'কোথাকার প্রিন্সেস?'

'স্বপন যদি প্রিন্স হতে পারে এ্যানিও প্রিন্সেস হতে পারে।'

'আমি কক্ষণো প্রিন্স হতে চাই না।' প্রতিবাদ করলো স্বপন

বাবা তাড়া দিলেন, 'রাজ—রাজড়ার গল্প গাড়িতে উঠেও করতে পারবে। সবাই ঝটপট উঠে পড়ো।'

ডেগেনডর্ফ থেকে মিউনিখ দেড়শ কিলোমিটারের কিছু বেশি। হাইওয়েতে ওঠার খানিক পরই স্বপনরা দেখলো শুধু ওরা নয়, আশে পাশের এলাকা থেকে আরও অনেক পরিবার মিউনিখের অক্টোবর ফেস্ট—এ যাচ্ছে। গাড়ির

আরোহীদের জমকালো সনাতনী পোষাকই বলে দিচ্ছিল ওদের গন্তব্য কোথায়। সেদিন আবহাওয়াতেও ছিল উৎসবের আমেজ। ভোরের নরম আলোয় নীল আকাশ চকচক করছে। কোথাও মেঘের কোনো চিহ্ন নেই। রাতের কুয়াশা তখনও ফিনফিনে মলমল কাপড়ের মতো হাইওয়ের ডান পাশে ঢেউ খেলানো রাইয়ের ক্ষেতে আর বাঁদিকে ইশার নদীর ওপর বিছানো ছিল। ফসলের ক্ষেতের পরই মাঝে মাঝে বন আর ছোট ছোট জনপদ। রঙিন কাঠের বাড়ির পাথরের চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠছে, জানালাগুলোর নিচে টবের ভেতর লাল, গোলাপি আর সাদা জেরানিয়াম থোকা থোকা ফুটে আছে। বাভারিয়া ছাড়া জার্মানির আর কোথাও এত জেরানিয়াম দেখা যাবে না।

ঘুম থেকে ওঠার পর পরই স্বপন নাশতা খেতে পারে না। এমনিতে ও ঘুম থেকে ওঠে ছটায়। নাশতা খেতে খেতে সাড়ে সাতটা আটটা বাজে। ঘরে হালকা কিছু ব্যায়ামের ফাঁকে টেলিভশনে মিউজিক্যাল শো দেখে। তারপর মাইল খানেক জগিং করে ফিরে এসে এক গ্লাস অরেঞ্জ জুস খায়। বাবা মা ওঠেন সাতটার দিকে। ওদের সঙ্গে নাশতার টেবিলে বসতে আরও আধঘন্টা। সেদিন শীলা ভোরে উঠেই বাবা মার সঙ্গে নাশতা সেরে নিয়েছিল। স্বপন দুটো স্যান্ডউইচ আর অরেঞ্জ জুস খেলো চলন্ত গাড়িতে বসে।

ওরা মিউনিখের যত কাছে আসছিল রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা ততই বাড়ছিল। বেশির ভাগই যাচ্ছিলো উৎসবে। রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় স্বপনদের গাড়ির স্পিড কমাতে হলো। ওরা মিউনিখ এয়ারপোর্ট পৌঁছলো নটা বাজার দশ মিনিট আগে। ওপরে ঝোলানো টেলিভিশনের পর্দায় লেখা দেখলো, কেএলএম সময় মতোই আসবে।

বাবা মা গাড়ি থেকে নামেননি। ভীষণ ব্যস্ত এয়ারপোর্ট মিউনিখ। গাড়ির পার্কিং—এ খুব অসুবিধে হয়। কাছাকাছি পার্কিং না পেয়ে বাবা বললেন, 'স্বপন আর শীলা গিয়ে রনিকে নিয়ে এসো। আমরা গাড়ি নিয়ে এদিকে ঘোরাঘুরি করবো। তোমরা এসে এই টেলিফোন বুথটার পাশে দাঁড়াবে।'

মিউনিখ এয়ারপোর্টের নাড়িনক্ষত্র সব কিছু স্বপনদের জানা। প্রতি বছর বাইরে যাওয়ার জন্য বার দুয়েক আসতে হয়। শীলা এক মুঠো চুইং গাম কিনলো। তারপর রনির জন্য এ্যারাইভাল লাউঞ্জে দাঁড়ালো। অক্টোবর ফেস্ট দেখার জন্য বিদেশী টুরিস্টও কম আসেনি। বেশিক্ষণ অবশ্য দাঁড়াতে হয়নি ওদের। মিনিট পাঁচেক পরই ওরা আগত যাত্রীদের ভিড়ে কাঁধে এয়ারব্যাগ, হালকা খয়েরি রঙের জ্যাকেট পরা রনির হাসিমাখা মুখ দেখতে পেলো।

চশমার ভেতর রনির দুষ্টুমিভরা চোখ দুটো ওদেরই খুঁজছিল। স্বপন গলা তুলে বললো, 'হাই রনি।'

রনি ওদের দেখতে পেয়ে হাত তুললো। ভিড় ঠেলে আসতে গিয়ে একে বুড়ির ধমক আর এক বুড়োর কটমটে চাউনি ওকে হজম করতে হলো। কাছে আসতেই শীলা বললো, 'বুড়িটা নির্ঘাত তোমাকে পছন্দ করে ফেলেছে, রনি, নইলে একতরফা এত কথা বলতো না।'

রনি হেসে বললো, 'পছন্দ করেছে বলেই আমাকে কয়েকবার যমের বাড়িতে পাঠিয়েছে। আর আমার বাবা মা, স্কুলের টিচার সবাইকে ধোলাই দিয়েছে।'

স্বপন জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার আর লাগেজ নেই?'

কাঁধের ব্যাগ দেখিয়ে রনি বললো, 'তিন চার দিনের জামা কাপড় এর ভেতরই আছে।'

'বললেই হলো, তিন চার দিন? সাত দিনের আগে আমরা তোমাকে যেতে দিচ্ছি না।' শীলা রায় ঘোষণা করলো।

'তার মানে আমাকে তোমার জামাকাপড় পরতে হবে।'

স্বপন বললো, 'তুমি আমার কাপড় পরবে। মেয়েদের কাপড় কেন পরতে যাবে?'

'তোমার প্যান্ট শার্ট পরলে আমাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।' রনির যা স্বাস্থ্য—কথাটা বাড়িয়ে বলেনি।

শীলা বললো, 'এখানে দাঁড়িয়ে বক বক না করে চলো গাড়িতে গিয়ে উঠি। বেচারা বাবা মা নিশ্চয় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।'

'ওঁরা এলেন না কেন?"

যেতে যেতে রনিকে পার্কিং—এর সমস্যার কথাটা বললো স্বপন। শেষ করলো এই বলে, 'কুতুব চাচা আর চাচী এলে বাবা খুব খুশি হতেন।'

'বাবা মা'র দম ফেলার সময় নেই। আজ থেকে প্যাকার্স কোম্পানির লোক আসবে। আগামী দশদিন যে কী ভয়ানক অবস্থা হবে ভাবতেও ভয় হয়।' বাবার বদলির আগের কয়েকদিনের অভিজ্ঞতা রনির জন্য মোটেই সুখকর নয়।

ওকে নিয়ে টেলিফোন বুথের পাশে মিনিট দশেক দাঁড়াতে হলো স্বপন আর শীলাকে। সাঁই করে এসে ওদের পাশে গাড়ি থামিয়ে বাবা হেসে বললেন, 'ভালো আছো তো রনি?' উত্তরের অপেক্ষা না করে তাড়া দিলেন, 'ঝটপট উঠে পড়ো। পুলিশ টের পেলে জরিমানার টিকেট লাগিয়ে দেবে।'

ওরা তিনজন পেছনে বসলো। চারজন আরামে বসা যায় বিএমডব্ল্যুর এই মডেলটায়। শীলা জানতে চাইলো, 'আমরা এখন কোথায় যাবো বাবা?'

'আগে ওল্ড মার্কেট স্কয়ারের কফি শপে গিয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিই। তারপর প্যারেডে যাবো।'

স্বপন মুখ টিপে হেসে বললো, 'এমন একটা দিনে বিয়ারের বদলে তুমি কফি দিয়ে গলা ভেজাবে বাবা?'

ওর কথা শুনে বাবাও হাসলেন—'আমি আর তোমার মা না হয় বিয়ার খেলাম। তোমাদের তো কফি খেতে হবে।'

'অক্টোবর ফেস্ট—এ এসে এক পাত্র বিয়ার খাবো না—একথা শুনলে আমাদের বন্ধুরা হাসাহাসি করবে। প্লিজ বাবা!'

'প্লিজ বললেও লাভ নেই। ষোল বছর হওয়ার আগে এ্যালকহল ছুঁতে পারবে না এ কথা আগেও তোমাদের বলেছি।'

শীলা ভালো মানুষ সেজে বললো, 'তোমরা বলছো কেন বাবা? আমি কি বিয়ার খেতে চেয়েছি?'

মা বললেন, 'আমি যদ্দুর জানি অক্টোবর ফেস্ট—এ ছোটদের জন্য নন এ্যালহলিক বিয়ার পাওয়া যায়।'

শীলা অবাক হয়ে জানতে চাইলো, 'বলো কি মা! সোনালি রঙ হয়, মগভর্তি ফেনা হয়!'

'সব হয়। খাওয়ার সময় গন্ধও পাবে। শুধু এ্যালকহলের ঝাঁঝটা সেখানে থাকবে না।'

'তাই সই বাবা।' স্বপন মন্তব্য করলো, 'বিয়ার হলেই চলবে। লোকে বুঝুক আমরা বড় হয়েছি।'।

রনি মৃদ হেসে বললো, 'আর কত বড় হবে স্বপন। এমনিতেই ছ ফুট ছুঁট ছুঁই

করছো।'

শীলা মুখ টিপে হাসলো—'কার্ল ছয় এক। সেজন্য স্বপনকে ছয় দুই হতে হবে।'

'কার্ল কে?' জানতো চাইলো রনি।

'শীলার প্রাণের বন্ধু।' খোঁচানোর ভঙ্গিতে বললো স্বপন।

'আমার কোনো প্রাণের বন্ধু নেই।' হেসে বললো শীলা—'তবে এ্যানির জন্য স্বপন প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকলেও সে কিন্তু পছন্দ করে উলফকে।'

স্বপন রেগে উঠলো—'দ্যাখ শীলা, সব সময় ভাঙা রেকর্ডের মতো এক কথা বার বার বলবি তো .....'

শীলা বাবার আড়ালে আশ্রয় নিয়ে বললো, 'জানি কান ছিঁড়ে ফেলবে।'

'কথাটা মনে রাখলে খুশি হবো।'

মা রনিকে বললেন, 'সারাক্ষণ দুটো দুরন্ত চড়ুই পাখির মতো একজন আরেক জনকে খোঁচাচ্ছে।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে দু' দণ্ড কথা বলা উপায় নেই। চারদিকে থেকে লোকজনের ধাক্কা—ধাক্কি দেখে মনে হচ্ছে যেন সবাই শেষ বাস মিস করতে যাচ্ছে। ভিড়ের ভেতর মোটা সোটা এক হাইল্যান্ডার জার্মান বাবাকে ধাক্কা দিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন—'আরে শফিক তুমি এখানে!' ভদ্রলোকের চোখ দুটো দুর্লভ জিনিস আবিষ্কারের উচ্ছ্বাসে জ্বলজ্বল করে উঠলো।

বাবাও উচ্ছ্বসিত গলায় বললেন 'উলরিখ তুমি? কতদিন পর দেখা হলো বলতো?'

এরপর দুজনের কোলাকুলি আর হাত মেলানো শেষই হতে চায় না। হঠাৎ বাবার মনে পড়লো তাঁর সঙ্গীদের কথা। মাকে বললেন, 'ইভা, আগে না দেখলেও উলরিখের কথা তোমাকে বলেছি। এদেশে এসে ফ্র্যাঙ্কফুর্ট—এ যার বাড়িতে প্রথম ছিলাম। তুখোড় সাংবাদিক! ডার স্পিগেলে আছে।'

মা হেসে উলরিখের সঙ্গে হাতে মেলালেন—'আপনার কথা অনেক শুনেছি। পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে ছেলেমেয়েদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বাবা বললেন, 'উলরিখ আমার সবচেয়ে বিপদের দিনের বন্ধু।'

স্বপন, শীলা, রনি সবাই তাঁকে খাঁটি জার্মান কায়দায় অভিবাদন জানিয়ে বললো, 'গুটেনটাখ।'

অভিবাদনের জবাব দিয়ে উলরিখ বন্ধুকে নিয়ে পড়লেন—'অনেক কথা জমে আছে শফিক। চলো এক পাত্র কড়া হুইস্কি পান করি। ফ্রুলাইন ইভা, আপনিও চলুন। ছেলেমেয়েরা নিশ্চয় নিজেদের মতো ঘুরে বেড়াতে বেশি পছন্দ করবে।' এই বলে বন্ধুকে চোখ টিপলেন।

বাবা হাসলেন—'তুমি আগের মতোই আছো। ঠিক আছে স্বপন। দুপুরের লাঞ্চ পর্যন্ত তোমরা মুক্ত। একটায় আমরা গাড়ির সামনে মিলিত হবো। কোনো উল্টোপাল্টা কাজ করবে না।'

ভিড়ের জন্য ওদের গাড়ি বেশ খানিকটা দূরে পার্ক করতে হয়েছে। অযাচিত স্বাধীনতা পেয়ে স্বপনরা বেজায় খুশি—'আমাদের জন্য ভোবো না। আমরা ঠিক থাকবো।' বলে দুই হাতে শীলা আর রনিকে ধরে চোখের পলকে স্বপন ভিড়ে মিশে গেল।

অক্টোবর ফেস্ট—এর বিশাল আয়োজন দেখে রনির চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে। বার বার বলছিল, 'বন—এ এরকম উৎসবের কথা স্বপ্নেও ভাবা যায় না।' উৎসবে যারা এসেছে সবাই পরেছে পুরোনো দিনের জমকালো পোষাক। ছেলেদের অনেকের কোমরে তলোয়ার ঝোলানো। কেউ আবার হাতলে নক্‌শার ভেতর রঙ বেরঙের পাথর বসানো লম্বা নলের পিস্তল গুঁজেছে কোমরের বন্ধনিতে। মেয়েরা ফোলানো ঝলমলে গাউন পরেছে, কারো টুপির ঝালর মুখটাকে করে তুলেছে রহস্যময়। কাছাকাছি গ্রাম থেকে ঘোড়ায় টানা গাড়িতে কাঠের পিপে ভর্তি বিয়ার এনে রাস্তায় ধারেই বিক্রি করতে বসে গেছে চাষি পরিবার। সঙ্গে ঘরে বানানো কেকও আছে কয়েক রকম।

রনি জানতো না বলে প্যান্টের ওপর উলের সাধারণ জ্যাকেট পরে এসেছে। উৎসবের ঘটা আর পোষাকের বাহার দেখে ওর খুব লজ্জা লাগছিল। স্বপন ওকে লম্বা পালক বসানো জিপসিদের একটা লাল রঙের টুপি কিনে দিয়েছে। ওতে অবশ্য ওর চেহারায় খানিকটা উৎসবের ছোট লেগেছে।

ঘড়িতে তখন ঠিক বারোটা। ওরা বসেছিল ইংলিশার গার্টেন—এ। মিউনিখের সবচেয়ে বড় পার্ক এটা। উৎসবের জন্য পার্কের ভেতর ফাইবার গ্লাসের চেয়ার টেবিল পেতে বসার জায়গা করা হয়েছে। ওদের তিনজনের সামনে মগভর্তি বাভারিয়ান বিয়ার। ছোটদের জন্য বিশেষভাবে বানানো, একফোঁটা এ্যালকহল নেই অথচ বিয়ারের রঙ আর ফেনা ষোলআনাই আছে। গত দু ঘন্টায় ওরা দু'মগ শেষ করেছে, এটা তৃতীয় মগ। স্বপনদের সবচেয়ে কাছের টেবিলে বসেছিল দুই জার্মান যুবক। একজনের বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ হবে, আরেকজন তিরিশের কাছে। কম বয়সী যুবকটি খুবই সুন্দর দেখতে, ঠিক সিনেমার নায়কদের মতো। শীলাই ওকে প্রথম দেখে নিচু গলায় রনিকে বরেছে, 'আমাদের পাশের টেবিলে কমবয়সী লোকটাকে দেখ, ঠিক হিউবনারের মতো মনে হচ্ছে।'

জার্মান ছবির অতি পরিচিত নায়ক হিউবনার। মেয়েরা ওর নামে পাগল। রনি এক ঝলক দেখে বললো, 'মতো কেন বলছো? আমার তো মনে হয় এই হিউবনার।'

'আমার তা মনে হয় না। এ যদি হতো হিউবনার এতক্ষণে অটোগ্রাফ নেয়ার জন্য লম্বা লাইন পড়ে যেতো।'

স্বপন বললো, 'হিউবনার যদি অক্টোবর ফেস্ট দেখতে আসে এখানে ওর থাকার কথা নয়। ওরা থাকবে হোটেল হিল্টন ইন্টারন্যাশনালে।'

পাশের টেবিলের ওরা এতক্ষণ নিচু গলায় কথা বলছিল। হঠাৎ সুদর্শনের গলা এক ধাপ ওপরে উঠেলো—'তোমাকে আগেই বলেছিলাম রেগেনবার্গে না পেলে আশে পাশে কোথাও আমাদের জন্য হোটেল বুক করো। এদ্দিন কুঁড়ের মতো বসে বসে সময় কাটিয়ে এখন বলছো হোটেল পাওয়া যাবে না। তোমার কাজে আমি খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছি রোমের।'

'একেবারে যাবে না তাতো বলিনি।' বিব্রত গলায় ওর সঙ্গী রোমের বললো, 'তুমি আমাকে বলেছো দু' সপ্তাহ আগে। এদিককার সব হোটেলে এ সময় এক মাস আগে বুক করতে হয়। রেগেনবার্গের এক গেস্ট হাউসে বলে রেখেছি তিন দিন পর দুটো ঘর পাওয়া যাবে।'

'মিউনিখে বসে এ তিন দিন কি আমি ইউনিটের লোকদের নিয়ে ঘোড়ার ঘাস কাটবো?' বিদ্রুপভরা গলায় বললো সুদর্শন।

'আমি দুঃখিত ডালমান।'

ওদের কথা শুনতে শুনতে শীলা দু'বার স্বপনের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলো। ও কী বলতে চায় স্বপন ঠিকই বুঝতে পারলো। রোমের দুঃখিত চেহারা নিয়ে ডালমানের রাগী চোখের সামনে বসেছিল। স্বপন উঠে ওদের টেবিলে গিয়ে বললো, 'আপনার কথা আমি শুনে ফেলেছি বলে দুঃখ প্রকাশ করছি হের ডালমান। মনে হয় আপনি বাভারিয়ার বনের কাছে কোনো হোটেলের সন্ধান করছেন?'

'হ্যাঁ করছি।' সামান্য রুক্ষ গলায় ডালমান বললো, 'আশা করি এতে তোমাদের কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। যে কোনো টুরিষ্টই এ সময় বাভারিয়া বা বোহেমিয়ায় থাকার জন্য হোটেল খুঁজতে পারে।'

'এ ব্যাপারে আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারি।'

'তুমি কে? কিভাবে সাহায্য করবে আমাকে?'

'আমার নাম স্বপন। ডেগেনডর্ফে আমাদের একটা চমৎকার হোটেল আছে। আপনি ইচ্ছে করলে ওখানে থাকতে পারেন। রেগেনবার্গ থেকে বেশি হলে বিশ মিনিটের পথ।'

'ডেগেনডর্ফের কোন হোটেলের কথা বলছো?' জানতে চাইলো রোমের।

'হোটেল জেরানিয়াম। ডেগেনডর্ফের সবচেয়ে ভালো হোটেল।'

'হ্যাঁ, নাম শুনেছি। আসলে ডেগেনডর্ফের কথা আমার মনে ছিল না। খুবই ছোট লোকালয়।'

'হোক ছোট। এটা তো স্বীকার করবেন ডেগেনডর্ফের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের যে কোনো তুলনা নেই?'

'আমি ওদিকে কখনও যাইনি।'

'তুমি না গেলে কি ডেগেনডর্ফের সৌন্দর্যে ভাটা পড়বে?' সুদর্শন যুবক ডালমান বিরক্তি মেশানো গলায় বললো, 'দয়া করে যদি হোটেল জেরানিয়ামে তিনটে কামরা বুক করো আমি বাধিত হবো।'

'তোমাদের হোটেল কি টেলিফোনে বুক করা যাবে?' স্বপনের কাছে জানতে চাইলো রোমের।

'যাবে'। খুশিভরা গলায় স্বপন বললো, 'ইচ্ছে করলে আপনারা আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন। সন্ধ্যায় বাজি পোড়ানো শেষ হলেই আমরা ডেগেনডর্ফ যাবো। ততক্ষণ আনন্দ করুন।'

'আনন্দ করার এতটুকু সময় আমার হাতে নেই। এখনই হোটেলে গিয়ে স্ক্রিপ্ট নিয়ে বসতে হবে। ভালো কথা, তোমাদের হোটেলে গাড়ি পাওয়া যাবে তো? নাকি এখান থেকে যেটা নেবো সেটা রেখে দিতে হবে?'

'আমাদের নিজেদের দুটো গাড়ি আছে। দরকার হলে অতিথিরা আমাদের গাড়ি ভাড়া করেন। কিছু যদি মনে না করেন, এ এলাকায় আপনারা কতদিন থাকবেন?'

'কাজের ওপর নির্ভর করছে। শার্লেমানের আমলে এদিকে বেশ কিছু দুর্গ বানানো হয়েছিল। মূলত এসবের সন্ধান করতেই আমরা এখানে এসেছি। জার্মান টেলিভিশনের জন্য একটা ডকুমেন্টারি ফিল্ম বানাচ্ছি আমি।'

'তাহলে আপনি ঠিক জায়গাতেই এসেছেন। বাভারিয়ার পাহাড়ে বেশ কয়েকটা পুরোনো দুর্গ আছে।'

স্বপনের কথা শুনে ডালমানের মুখে হাসি ফুটলো—'তুমি নিজে দেখেছো সে সব দুর্গ?'

আমাদের হোটেল থেকে মাইল দশেক দূরে একটা ভাঙা দুর্গ আছে। জানি না ওটা শার্লেমানের কিনা। তবে অনেক পুরোনো। ছোটবেলায় ওখানে গিয়েছি। একটা পুল পেরোতে হতো ওখানে যেতে। চার বছর আগে একবার প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছিল। তখন পাহাড়ি স্রোতের তোড়ে পুলটা ভেঙে গেছে। এরপর আর যাইনি।'

'তোমাকে ধন্যবাদ স্বপন।' যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে স্বপনের সঙ্গে হাত মেলালো ডালমান। 'তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি। বড় রকমের একটা দুঃশ্চিন্তা থেকে আমাকে বাঁচিয়েছো তুমি। তোমরা ফেরার পথে আমাদের হোটেলে এসো। আমরা ম্যাক্সমিলিয়ন স্টুবেন—এ আছি। সবাই মিলে একসঙ্গে যাবো।'

ডালমান আর রোমের চলে যাওয়ার পর রনি প্রশংসাভরা গলায় বললো, 'ভালো ব্যবসা শিখে ফেলেছো স্বপন। হোটেল নিয়ে চাচাকে আর মাথা ঘামাতে হবে না।'

স্বপন লাজুক হাসলো—'এ বছরের টুরিষ্ট সিজনটা অন্য সব বছরের মতো জমজমাট ছিল না। নইলে এভাবে গায়ে পড়ে কাউকে বলতাম না।'

শীলা বললো, 'ঘর তো মাত্র দুটো খালি। আরেকটা ঘর কোথায় পাবো?'

'পাঁচ নম্বরের ম্যাডাম লিসবেথ আজ সন্ধ্যার চলে যাবেন।' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো স্বপন।

'ডালমানকে আমার খুব হিংসা করতে ইচ্ছে হচ্ছে।' উদাস গলায় বললো রনি।

'কেন?' জানতে চাইলো স্বপন।

'যে ক'দিন ও জেলানিয়াম—এ থাকবে, শীলার আদর যত্ন সব ওর কপালেই জুটবে।'

'কক্ষণো নয়।' আপত্তি জানালো শীলা—'ডালমানদের যত্ন নেয়ার জন্য মিস মার্থাই যথেষ্ট।'

স্বপন বললো, 'একটা বাজতে আর বেশি দেরি নেই, চলো গাড়ির কাছে যাই।'

ততক্ষণে গোটা মিউনিখ শহর উৎসবের আনন্দে মেতে উঠেছে। যদিও আসল প্যারেড হবে বিকেলে, যেখানে দেড়শ বছর আগের যুবরাজ লুডভিগ আর রাজকুমারী থেরেসা সাজবে উৎসবের সবচেয়ে সুন্দর দুই তরুণ তরুণী; আর সবাই হবে সভাসদ, সহচর, সৈন্য সামন্ত। গাইয়ে, নাচিয়ে, বাজিয়ে সবাই

মিলে দারুণ জমজমাট বিশাল মিছিল নিয়ে মিউনিখের বড় রাস্তা ঘুরে পার্কে জড়ো হয়। সন্ধ্যার পর শুরু হয় বাজি পোড়ানোর উৎসব।

গাড়ি রাখার জায়গায় এসে স্বপনরা দেখলো বাবা মা আগেই এসে গেছেন। বাবা বন্ধু উলরিখও আছেন সঙ্গে। চেহারা দেখেই মনে হয় প্রচুর পান করেছেন তিনি অকারণে হাসছেন, চেঁচিয়ে কথা বলছেন, বলতে গিয়ে হাত পা ছুঁড়ছেন, অবশ্য কেউ এতে কিছু মনে করছে না কারণ বেশির ভাগ বাভারিয়ানই মনে করে মদ খেয়ে মাতাল না হলে উৎসবের অর্ধেক আনন্দই মাটি।

স্বপনকে দেশে উলরিখ হইচই করে উঠলেন—'এই যে রাজকুমার লুডভিগ। ভাই বোন দুটিকে সঙ্গে নিয়ে কোন রাজকুমারীর খোঁজে গিয়েছিলে'। এই বলে শীলা আর রনিকে নেশাজড়ানো চোখে ভালো করে দেখে বললেন, 'বোনটিকে রাজকুমারী মনে হলেও ভাইটিকে সাধারণ প্রজা বলে মনে হচ্ছে ইভা! ছোট ছেলেটাকে তুমি অবহেলা করছো!'

মা বিব্রত গলায় বললেন, 'উলরিখ, ও হচ্ছে রনি। বাংলাদেশ এম্ব্যাসির কাউন্সিলারের ছেলে। আজ সকালেই মিউনিখ এসেছে। এই উৎসবের কথা জানতো না।'

'এই যাঃ, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। শফিক তো বলেছিল ওর বন্ধুর ছেলে। ইভা, আমি কি এরই মধ্যে মাতাল হয়ে পড়লাম? এখনও তো সূর্য ডুবতে অনেক দেরি!'

উলরিখের কাঁধে হাত রেখে মৃদু হেসে বাবা বললেন, 'কিছুটা তো মাতাল হয়েছো। এর বেশি হলে তোমাকে সামলানো যাবে না। চলো, দুপুরের খাবারটা সেরে ফেলি।'

'ঠিক বলেছো। আমি খিদের জ্বালায় আবোল তাবোল বকছি। হের প্রিন্স লুডভিগ, আশা করি আমার কথায় তোমরা কিছু মনে করোনি।'

উলরিখের কথা শুনে স্বপন একটু অস্বস্তি বোধ করছিল। তবু হেসে বললো, 'না আঙ্কল, কিছু মনে করবো কেন? আমরা আসলে একটা ব্যবসায়িক আলোচনায় সময় কাটিয়েছি।'

ওর কথা শুনে বাবা মা দু'জনই অবাক হলেন। উলরিখ বললেন, 'উৎসবে এসে ব্যবসার আলাপ কেন বাছা?'

'হামবুর্গ থেকে একটা ফিল্ম ইউনিট এসেছে। বাভারিয়া আর বোহেমিয়ার পাহাড়ে পুরোনো দুর্গের ছবি তুলবে। থাকার জায়গা পাচ্ছিল না। আমি গিয়ে আমাদের হোটেলে থাকার আমন্ত্রণ জানালাম। ওরা রাজী হয়েছে।'

'ফিল্ম ইউনিট মানে তো অনেক লোক!' মা বললে, 'আমাদের হোটেলে এত লোক জায়গা দেবো কোত্থেকে? মাত্র দুটো ঘর খালি আছে।'

'ওরা লোক বেশি না মা। তিনটা ঘর দরকার। ম্যাডাম লিসবেথ তো আজ সন্ধ্যায় চলে যাবেন। তখন ওঁর ঘরটা ওদের দেয়া যাবে। ওরা আমাদের সঙ্গেই যাবে।'

'ম্যাডাম লিসবেথ আজ যেতে পারেন, যাবেনই এটা নিশ্চিত নয়।'

'সেক্ষেত্রে আমার ঘরটা আমি ছেড়ে দিতে পারি। শীলা, রনি, আমি এক ঘরে থাকবো।'

টুরিস্ট সিজনে অনেক সময় লোকজন বেশি এলে স্বপন ওর ঘর ছেড়ে দেয়। তবে এবার সঙ্গে রনি থাকাতে মা ইতস্তত করলেন—'শীলার ঘর ছোট, রনির অসুবিধে হবে।'

রনি ব্যস্ত গলায় বললো, 'আমার জন্য মোটেও ভাববেন না চাচী। আমরা সবাই একসঙ্গে থাকলে বেশি মজা হবে।'

বাবা খুশিভরা গলায় বললেন, 'আমাদের স্বপন তাহলে সাবালক হয়ে গেছে! একা একা একটা ব্যবসায়িক আলোচনা সারলো।'

'একেবারে প্রফেশনালদের মতো কথা বলেছে চাচা।' রনি মন্তব্য করলো, 'আমার মনে হয় না আপনি ওদের স্বপনের মতো পটাতে পারতেন।'

স্বপন লজ্জা পেয়ে প্রসঙ্গ পাল্টালো—'আমার পেটের ভেতর নেকড়ের আঁচড় অনুভব করছি। আমি ভীষণ ক্ষুধার্ত।'

'আমিও।' বললেন উলরিখ—'চলো সবাই, রাস্তার ধারে বসে হাঁসের রোস্ট আর বাভারিয়ান সালাদ খাবো।'

গ্রাম থেকে আসা চাষি পরিবারগুলো ঘরে বানানো মদের সঙ্গে খাবারও পরিবেশন করছিল। ওরা সবাই চীনা হাঁসের রোস্ট খেলো মজা করে। সঙ্গে ছিল আলু, মটরশুটি, ফুলকপি, ক্যাপসিকাম আর দু তিন রকম ডালের অঙ্কুরের সঙ্গে হোয়াইট সস মেশানো দারুণ মজার এক সালাদ। খিদে শুধু স্বপন আর উলরিখের নয়, সবারই লেগেছিল। দুটো আস্ত হাঁসের রোস্ট অল্প সময়ের ভেতর হাওয়া হয়ে গেল। ঘরে বানানো লাল ময়দার রুটি আর মাখন ছিল পর্যাপ্ত। উলরিখ একা একতাল মাখনের সঙ্গে আস্ত রুটি সাবাড় করলেন।

খাবার শেষ করে সবাই যোগ দিলো ফ্যাশন প্যারেডের হুল্লোড়ে। কালো ভেলভেটের আলখাল্লার মতো একটা গায়ে দিয়ে দুটো নকল দাঁত আর হাতে লম্বা নখ লাগিয়ে উলরিখ ড্রাকুলা সেজেছেন। মহিলারা একজন নাদুশ নুদুশ

ড্রাকুলা দেখে হেসে খুন হলো। স্বপন কয়েকবারই লক্ষ্য করেছে কম বয়সী বেশ কয়েকটা মেয়ে মুগ্ধ চোখে ওকে দেখেছে। শীলা রনির সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত ছিল বলে দেখতে পায় নি। তবে ন্যাড়া মাথা তিনটে পাঙ্ক পাশ দিয়ে যাবার সময় ইচ্ছা করেই স্বপনকে ধাক্কা দিয়েছে। বাবা সঙ্গে থাকাতে ও কিছু বলতে পারলো না। একবার একা একটা স্কীনহেড ওর সঙ্গে লাগতে এসেছিল। ওর দুটো কড়া পাঞ্চ খেয়ে বেচারা দু'চোখে অনেকগুলো তারা দেখতে দেখতে ভেগেছে।

সন্ধ্যার পর পুরো চল্লিশ মিনিট আতশ বাজির উৎসব দেখে আটটায় ওরা গাড়ি নিয়ে ম্যাক্সমিলিয়ন স্ট্রাসেতে ডালমানের হোটেলে এল। ডালমান আর তার তিন সঙ্গী বাক্স প্যাটরা নিয়ে লাউঞ্জে অপেক্ষা করছিল। স্বপনকে দেখে বললো। 'তোমার দেরি দেখে আমি ভাবছিলাম ভুলে গেলে কিনা!'

'আমি দুঃখিত হের ডালমান।' স্বপন বিনীত গলায় জানতে চাইলো। 'আপনারা কি অনেকক্ষণ এখানে অপেক্ষা করছেন?'

'মিনিট পঁচিশেক হবে। আমরা কি এখন রওনা দিতে পারি?'

'নিশ্চয়, আমার বাবা মা ভাই বোন বাইরে গাড়িতে অপেক্ষা করছে। আপনাদের গাড়ি রেডি আছে।'

'আমাদের জিনিষপত্র বেশি। একটা মাইক্রোবাস নিয়েছি।' এই বলে ডালমান সঙ্গীদের দিকে তাকালো—'চলো যাওয়া যাক।'

ডালমান যে বেশ রাগী মানুষ এটা স্বপন শীলারা দুপুরে পার্কে বসেই টের পেয়েছে। স্বপন মনে মনে উদ্বিগ্ন ছিল ওদের জেরানিয়াম যদি ওর পছন্দ না হয়! শীলাকে ও ডেগেনডর্ফ আসার পথে গাড়িতে বলেছে, 'ওদের লাইঞ্জে বসিয়ে কফি খাওয়াতে খাওয়াতে মার্থাকে নিয়ে ঘর দুটো ভালোভাবে গুছিয়ে ফেলবি

ঘর সাজাবার ব্যাপারে শীলা জাদু জানে। রুক্ষ মেজাজী ডালমান পর্যন্ত ঘর দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল—'বাহ, চমৎকার ঘর! এরকম একটা গেঁয়ো জায়াগায় এত সুন্দর হোটেল আমি আশা করিনি।' এই বলে পুব দিকের জানালা খুলে কুয়াশাভেজা হেমন্তের জ্যোৎস্নার আলোয় ভেসে যাওয়া বাভারিয়ার পাহাড় আর বন দেখে মন্তব্য করলো, 'ঠিক এরকম একটা জায়গা আমি মনে মনে খুঁজছিলাম।'

ডালমানরা আপাতত দুটো ঘরে থাকতে আপত্তি করেনি। ম্যাডাম লিসবেথ যাবেন দু'দিন পর তখন ওদের তিনটে ঘর দেয়া হবে। ডালমানদের এক মাস থাকার প্ল্যান আছে। সকালে নাশতা করার জন্য ওরা যখন নিচে নেমেছিল

তখন টমাস জেনে নিয়েছে ক'দিন থাকবে। নাশতা খেয়েই মাইক্রোবাস নিয়ে বেরিয়ে গেছে ডালমান। সঙ্গে ছোট বড় নানা সাইজের সাত আটটা বাক্স। রনি একবার স্টুডিওতে গিয়ে দেখেছিল কিভাবে সিনেমার সুটিং হয়। শীলাকে বললো, 'ওদের সঙ্গে যাবে নাকি সুটিং দেখতে?'

শীলার ইচ্ছা ছিল। তবে সুটিং দেখবো বলাটা ভালো দেখায় না। তাই ডালমানকে ঘুরিয়ে বললো, 'আপনারা পুরোনো দুর্গ খুঁজছিলেন। আমরা কি সঙ্গে আসবো পথ দেখাবার জন্য।'

মিষ্টি হেসে ডালমান বললো, 'না, দরকার হবে না। টমাসের কাছ থেকে আমরা পথ জেনে নিয়েছি।'

ডালমানরা চলে যাওয়ার পর স্বপন বললো, 'সুটিং দেখার জন্য ওদের সঙ্গে যেতে হবে কেন? আমরা আমাদের মতো ঘুরতে যেতে পারি। ঘুরতে ঘুরে সুটিং দেখা হয়ে যাবে।'

রনি খুশিভরা গলায় বললো, 'দারুণ হবে স্বপন! শার্লেমানের পুরোনো দুর্গ দেখা, সেই সঙ্গে ছবির সুটিং দেখা—খুবই ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে।'

বিপদের হাতছানি

সুটিং এর দলবল আর জিনিসপত্র নিয়ে ডালমান বেরিয়েছে সকাল নটার দিকে। হোটেলের ম্যানেজার টমাসকে বলে গেছে ওরা কেউ দুপুরে খাবে না। ফিরবে একেবারে রাতে। ওদের বেরিয়ে যাওয়ার ঘন্টা খানেক পর স্বপন, শীলা আর রনিও সারাদিনের জন্য বেরিয়ে পড়লো ছোট একটা ফলক্স ভাগেন নিয়ে। পনেরাশ' সিসির এ গাড়িটা স্বপন নিজে চালায়। অবশ্য শীলাকে স্কুল থেকে আনা নেয়ার কাজটাও ওকে করতে হয়।

ডালমানরা কোথায় যাচ্ছে সে খবর টমাসই দিয়েছে স্বপনদের। টিটলিঙের পুরোনো দুর্গে বছর পাঁচেক আগেও ওরা বেড়াতে গিয়েছিল। কিছুটা তখন পর্যন্ত মোটামুটি দাঁড়িয়ে থাকলেও বেশির ভাগ অংশ বয়সের ভারে ভেঙে পড়েছে। টমাসের অবশ্য ধারণা ওটা শার্লেমানের আমলে বানানো হয়েছিল। জার্মানির দক্ষিণে, পুবে আর ফ্রান্সের উত্তরে বারোশ' বছর আগে তখনকার ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিমান রাজা শার্লেমান জার্মান সাক্সেনদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে অনেকগুলো দুর্গ বানিয়েছিলেন। নিজেকে তিনি মনে করতেন খ্রিস্টধর্মের একজন রক্ষক হিসেবে। উত্তর স্পেনের সীমানা থেকে শুরু করে ইটালি, ফ্রান্স, জার্মানি, হাঙ্গেরি আর চেকোশ্লোভাকিয়ার একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল তাঁর রাজত্ব।

স্কুলে ইউরোপের ইতিহাসের ক্লাসে শার্লেমানের ওপর পড়তে হয়েছে স্বপনদের। নিষ্ঠাবান খৃষ্টানরা এখনও ভক্তির সঙ্গে তাঁর নাম স্মরণ করে। জার্মানির আচেন গির্জায় শার্লমানের নিরাভরণ মার্বেল পাথরের সিংহাসন রাখা আছে। যে কারণ আচেন পরিণত হয়েছে তীর্থস্থানে। স্বপনরা খবরের কাগজে দেখেছে এতকাল বুড়ো খ্রিস্টানরাই বেশি যেতো গির্জা আর অন্য সব তীর্থস্থানে। ইদানীং তরুণদেরও ভিড় হচ্ছে সেখানে। বলা বাহুল্য এরা নব্য নাৎসি, যারা মনে করে কমিউনিজমের নাম নিশানা পৃথিবী থেকে মুছে ফেলতে হলে খ্রিস্টধর্মকে চাঙ্গা করতে হবে।

গাড়িতে যেতে যেতে রনি বললো, 'ডালমান লোকটাকে রহস্যময় মনে হচ্ছে শার্লেমানের ব্যাপারে ওর এত উৎসাহ কেন?'

স্বপন মন্তব্য করলো, 'হয়তো রিপাবলিকার তরফ থেকে ওকে শার্লেমানের গির্জার ছবি করার দায়িত্ব দিয়েছে।'

(রিপাবলিকা হচ্ছে নব্য নাৎসিদের দল, যারা হিটলারের নাৎসিবাদে বিশ্বাসী।)

'লোকটার ওপর নজর রাখা দরকার।' গম্ভীর গলায় বললো রনি।

'কোনো দরকার নেই।' শীলা হেসে বললো, 'ভদ্রলোক স্যুটিং করতে এসেছেন। আমাদের হোটেলের একজন বোর্ডার যদি টের পান ওঁর ওপর আমরা গোয়েন্দাগিরি করছি, নিশ্চয় আমাদের সম্পর্কে ধারণা ভালো হবে না।'

নব্য নাৎসিদের দু' চোখে দেখতে পারে না রনি। একবার স্কুল থেকে ফেরার পথে ওদের পাল্লায় পড়েছিল। চার পাঁচজন মিলে মনের সুখ মিটিয়ে ওকে পিটিয়েছে। অপরাধ একটাই, ও জার্মান নয়। নাৎসিদের দাবি হচ্ছে জার্মানিতে জার্মান ছাড়া আর কেউ থাকতে পারবে না। রনির মার খাওয়ার ঘটনা নিয়ে কূটনীতিকদের মহলে বেশ হইচই হয়েছিল কয়েকজন নাৎসিকে পুলিশ গ্রেফতারও করেছিল রনি কাউকে চিনতে পারেনি। ওকে পেটানোর সময় ওরা মুখোশ পরা ছিল। মুখোশ মানে কালো মুজোর ভেতর পুরো মাথা ঢোকানো, চোখের জায়গায় শুধু দুটো ফুটো করা। জেনে শুনে স্বপনরা ওদের হোটেলে নাৎসিদের থাকতে দেবে এটা ওর পছন্দ হচ্ছিল না। অবশ্য ডালমান যে নাৎসি এর কোনো প্রমাণ ওর কাছে নেই।

টিটলিঙের ভাঙা দুর্গে যাওয়ার পথ খুব একটা সুবিধের নয়। ঘন জঙ্গল আর পাহাড়ের কিনার ঘেঁষে অনেক কাল আগের পাথরে বাঁধানো রাস্তায় চিহ্নটুকু আছে। বেশির ভাগ পাথরই উধাও হয়ে গেছে। শক্ত মাটির উচু নিচু রাস্তা স্বপনকে খুবই ধীরে চালাতে হচ্ছিল। ছোট হলেও গাড়িটা খুব শক্ত। পথে দুটো ছোট গ্রাম পড়েছে, প্রথম চার মাইলের ভেতর। তারপরই টিটলিঙ গ্রাম। এখনকার জাদুঘরের বেশ নাম আছে। এর পর শুধু বন। ওক আর চেস্টনাট গাছের শুকনো পাতায় বোঝাই হয়ে আছে সারাটা পথ। স্বপনদের ভাগ্য ভালো বলতে হবে, ভেঙে যাওয়া কাঠের পুলটা আবার মেরামত করা হয়েছে। নইলে পাহাড়ি ঝর্ণার এপাশে গাড়ি রেখে দু'মাইল পথ হেঁটে যেতে হতো। গাড়ি চালাতে চালাতে স্বপন বললো, 'ডালমানরা বোধ হয় এ পথে আসেনি।'

শীলা একটু অবাক হলো—'পথ তো এই একটাই। এ পথে না এসে আর কোন পথে আসবে।'

'পথ ভুল করে অন্য কোনো দিকে চলে যেতে পারে।'

'জাহান্নামে যাক ডালমান।' রনি বললো, 'এতটা পথ যখন এসেছি ভাঙা দুর্গটা দেখেই যাবো। কে জানে রাজা শার্লেমানের কোনো গুপ্তধন দুর্গের কোথাও লুকোনো আছে কিনা।'

রনির কথা শুনে শীলা হাসলো—'গুপ্তধন পেলে তুমি ওটা নিতে পারবে না। এখানকার আইনে আছে মাটির নিচের সমস্ত সম্পদের মালিক সরকার।'

'নিশ্চয় ভাঙা দুর্গে আইনের লোকরা পাহারা দিচ্ছে না?'

'যা পাবে অর্ধেক আমার।' রনি আর শীলার কথার মাঝখানে মন্তব্য করলো স্বপন।

'অর্ধেক নয়, তিন ভাগের এক ভাগ।' গম্ভীর গলায় ঘোষণা করলো রনি—'আমরা তিনজন আছি, ভুলে যেও না।'

শীলা হেসে বললো, 'শার্লেমানের গুপ্তধনের ওপর আমার কোনো লোভ নেই। আমি এসেছি ডালমানের সুটিং দেখার জন্য।'

'সেই সঙ্গে ছবিতে যদি একটা পার্ট জুটে যায় তাহলে তো কথাই নেই।"

'পার্ট করার ইচ্ছে থাকলে তোমার মতো ফুলবাবু সেজে আসতাম।'

অন্য সব দিনের চেয়ে স্বপনের চেহারা আর পোষাক সেদিন একটু বেশি চকচক করছিল। শীলার কথায় লজ্জা পেয়ে প্রসঙ্গ পাল্টালো—'আমার ধারণাই ঠিক হলো। ডালমানরা এখানে আসে নি।'

সামনে খাড়া পাহাড়ের বুকের ভেতর ভাঙা গির্জাটা কয়েক শ বছরের ইতিহাসের ছাপ গায়ে জড়িয়ে এখনও কোনো রকমে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিক একেবারে চুপচাপ। ডালমানের গাড়ি বা লোকজনের নাম নিশানা কোথাও নেই।

গাড়িটা পাহাড়ের নিচে একটা পুরোনো ওক গাছের নিচে রেখে ওরা এক এক করে নামলো। শীলা বললো, 'যার যার খাবার সঙ্গে নিয়ে নাও।'

স্বপন মাথা নাড়লো—'অযথা বোঝা বয়ে লাভ কী! দুপুরে খিদে পেলে এখানে এসে খাবো।'

রনি ওর কাঁধ ব্যাগে একটা চাদর আর ক্যামেরা এনেছিল। মিনারেল ওয়াটারের একটা বোতল ওর ব্যাগে ঢুকিয়ে বললো, 'দুপুর পর্যন্ত খিদে না পেলেও তেষ্টা নিশ্চয় পাবে।'

দুর্গের পাহাড়টা খুব বেশি উঁচু নয়। পাহাড়ের গা পেঁচিয়ে সরু একটা রাস্তা উঠে গেছে ওপরের দিকে। নিচে থেকে দেখলে মনে হয় গির্জাটা খুব বেশি হলে একশ ফুট উঁচুতে। ঘোরানো পথ দিয়ে ওপরে ওঠার সময় রনি ভেবেছিল আট দশ মিনিটের ভেতর বুঝি দুর্গে পৌঁছে যাবে। মহা উৎসাহে একটানা পনেরো মিনিট হাঁটার পরও যখন মনে হলো দুর্গটার সঙ্গে ওদের দূরত্ব এতটুকু কমেনি তখন খানিকটা দমে গেল। বললো, 'এটা কি ভূতুড়ে দুর্গ?'

স্বপন বললো, 'এমন কথা তো আগে শুনিনি! ভূতুড়ে, হতে যাবে কেন?'

'এই যে এতক্ষণ ধরে হাঁটছি। তার পরও মনে হচ্ছে দুর্গটা সমান দূরেই রয়ে গেছে। যেন আমরা এগুচ্ছি আর দুর্গটা পিছিয়ে যাচ্ছে। ম্যাকবেথের ডাইনিরা বলেছিল বন হাঁটবে। এখানে দেখছি দুর্গ হাঁটে।'

শীলা বললো, 'পাহাড়ে আগে ওঠোনি বলে এরকম মনে হচ্ছে। আর মিনিট দশকের ভেতর আমরা দুর্গে পৌঁছবো।'

সামনে পাহাড়ের একটা উঁচু খাড়ির পাশে রাস্তাটা মেয়েদের চুলের কাঁটার মতো তিনশ চল্লিশ ডিগ্রি বাঁক নিয়েছে। কাছাকাছি আসতেই ওপর থেকে ঘড় ঘড় করে ভারী কিছু গড়িয়ে নিচে আসার শব্দ হলো। স্বপন চিৎকার করে বললো, 'কিনারে সরে এসো। পাথর গড়াচ্ছে।'

স্বপনের বলার সঙ্গে সঙ্গে সবাই পাহাড়ের গায়ের দিকে সরে এসে সামান্য উঁচু একটা জায়গায় দাঁড়ালো। একটু পরেই বড় বড় তিনটা পাথরের টুকরো একের পর এক গড়িয়ে এসে ওদের গা ঘেঁষে নিচে নেমে গেল। পাথরের টুকরোগুলো আকার আর গতি দেখে ওরা সভয়ে একে অপরের দিকে তাকালো। স্বপনের কথা মতো সরে না এলে পাথরের ধাক্কা খেয়ে হাড়গোড় ভেঙে নিচে ছিটকে পড়তো ওরা। শুকনো মুখে রনি বললো, 'কী সাংঘাতিক! আর একটু হলেই ছাতু হয়ে যেতাম।'

'শুনেছি ভূমিকম্প হলে পাহাড়ের ওপর থেকে আলগা পাথর এভাবে গড়িয়ে আসে।' ঢোক গিলে বললো স্বপন।

'এ পাহাড়ে আলগা পাথর আসবে কোথেকে?' অবাক হয়ে স্বপনকে প্রশ্ন করলো শীলা।

'দুর্গটা পাথরের বানানো তারই কোনো অংশ ভূমিকম্পের জন্য গড়িয়ে আসতে। পারে।'

'ভূমিকম্প হলে আমরা ওপরে উঠছি কেন? ভয় পাওয়া গলায় বললো রনি—'চলো, ফিরে যাই।'

'না ভূমিকম্প নয়।' শীলা বললো, 'ভূমিকম্প হলে পাখিরা এত চুপচাপ গাছে বসে। থাকতো না। মানুষের আগে পশুপাখিরা ভূমিকম্পের কথা টের পায়।'

'তাহলে পাথর এভাবে গড়িয়ে এল কেন?'

'ওপরে গেলেই বোঝা যাবে।'

রনি আর স্বপন শীলার কথা মানতে বাধ্য হলো। বয়সে ছোট হলেও স্বপন জানে শীলা নানা বিষয়ে ওর চেয়ে অনেক বেশি পড়াশোনা করেছে। ওর আই কিউও খুব শার্প। মুখে অবশ্য এ কথা কখনও স্বপন স্বীকার করে না।

আরও মিনিট দশেক হাঁটার পর ওরা দুর্গের সামনে উপস্থিত হলো। এককালে উঁচু ফটক ছিল। গাছের গুঁড়ি কেটে বানানো ভারি দরজা ছিল। প্রহরীদের থাকার জায়গা ছিল। এখন তার কোনো চিহ্ন নেই। উঁচু দুটো পাথরের ঢিবির মাঝখান দিয়ে চওড়া রাস্তা চলে গেছে দুর্গের আঙিনায়।

দুর্গের দু'দিকেই উঁচু খাড়া পাহাড়। মনে হয় পাহাড় কেটে দুর্গটা খাঁজের ভেতর বসিয়ে দেয়া হয়েছে। পাহাড়ের গায়ের অংশ এখনও পুরো ভেঙে পড়েনি। বাইরে থেকে বোঝা যায় অনেকগুলো কামরা এখনও অক্ষত আছে।

ফটকের পাশে পাথরের যে প্রাচীর ছিল সেটাও অনেক জায়গায় ভেঙে গেছে। কোথাও কোথাও সূঁচোলো পাতার পাইন গাছের শক্ত শেকড়ে আটকা পড়েছে বলে প্রাচীর পুরোপুরি ভাঙেনি। শীলা আঙুল তুলে প্রাচীরের ভাঙা অংশের দিকে স্বপন আর রনির দৃষ্টি আকর্ষণ করলো—'ওখানে দেখ, অনেক আলগা পাথর। ওখান থেকে পড়লে সোজা রাস্তায় গড়িয়ে যাবে।'

রনি বললো, 'পাথর আপনাআপনি গড়াতে যাবে কেন? কেউ নিশ্চয় ঠেলে দিয়েছে।'

'পাথর ঠেলার জন্য এখানে কে আসবে? রনির কথা শুনে স্বপন একটু অবাক হলো।

'শার্লেমানের প্রাচীন দুর্গে কত অতৃপ্ত আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে তার কি হিসেব আছে?'

শীলা মৃদ হেসে বললো, 'আত্মাদের শরীর তো বাতাস দিয়ে বানানো। ওদের গায়ে এত জোর আছে নাকি—পাথর গড়িয়ে দেবে?'

'কেন হরর মুভিতে দেখনি রাগী আত্মারা কিভাবে মাটি ফুঁড়ে কবরের পাথর সরিয়ে বেরিয়ে আসে?'

'সিনেমায় ওরকম হয়। কেউ কি পরীক্ষা করে দেখেছে আত্মার গায়ে কত জোর?'

স্বপন বললো, 'রনি, সত্যি সত্যি আত্মা ফাত্মা বিশ্বাস করো নাকি?'

'অবিশ্বাস করার কী আছে? এ নিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে।' গম্ভীর হয়ে জবাব দিলো রনি।

স্বপন আর শীলা ভূত প্রেত বিশ্বাস করে না। রনির কথা শুনে ওরা হাসলো। শীলা বললো, 'ঠিক আছে, আজ তাহলে আত্মা দেখে বাড়ি ফিরবো।'

'তার মানে এখানে রাত কাটাবে?'

'রাতে ছাড়া আত্মার দেখা পাবো কিভাবে?'

শীলার কথা শুনে রনি ঘাবড়ে গেল। বললো, 'বাড়িতে বলে আসিনি। তাছাড়া রাতে থাকার জন্য তৈরিও হয়ে আসিনি।'

স্বপন হেসে বললো, 'শীলা তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছে রনি। না বলে বাড়ির বাইরে রাত কাটালে বাবা কাউকে আস্ত রাখবে না।'

হেমন্তের সূর্য তখন প্রায় মাথার ওপর উঠে এসেছে। পাহাড়ের নিচে ঘন সবুজ বন, এক চিলতে ডানিউব নদী, মাঝে মাঝে ছোট ছোট জনপদ ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মতো মনে হচ্ছিল।

ওরা বসেছিল একটা বুড়ো পাইন গাছের নিচে। স্বপন বললো, 'আমার ক্ষিদে পেয়ে গেছে শীলা। খাবারের প্যাকেটটা খোল।'

স্বপনের কথা শুনে হাসলো শীলা—'খাবারের প্যাকেট আনতে তুমিইতো বারণ করলে। এখন ক্ষিদে পেলে হেমন্তের তাজা বাতাস খাও।'

রনি বললো, 'শুকনো বাতাস খেতে অসুবিধে হলে আমার বোতলে পানি আছে।'

নিজের বোকামি দেখে নিজের ওপরই রাগ হলো স্বপনের। অপ্রস্তুত হয়ে বললো, 'আমি রনির কথা ভেবে খাবারের কথা বলেছিলাম। ওর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে পাহাড়ে ওঠার অভ্যাস নেই।'

রনি বললো, 'ক্ষিদে যে একবারে লাগেনি তা বলবো না। তবে এখনকার মতো পানি খেলেও চলবে।'

শীলা মন্তব্য করলো, 'বাভারিয়ার বাতাসে ঘুরলে ঘন ঘন ক্ষিদে পায়।'

রনির এক বোতল পানি ওরা তিনজনে সাবাড় করে ক্ষিদে দূর করলো। শীলা বললো, 'রনি দুর্গ দেখতে চেয়েছিলে। ভেতরে যাবে না?'

'শালেমানের দুর্গ এতটা ভূতুড়ে চেহারার হবে আশা করিনি। আমায় ভেতরে যেতে ইচ্ছে করছে না।'

স্বপন মৃদু হেসে বললো, 'তুমি কি আশা করে ছিলে প্রহরীরা কাঠের ফটক খুলে দিয়ে আমাদের ভেতরে ঢোকাবে, আর দুর্গপ্রধান এসে স্বাগত জানিয়ে সব ঘুরিয়ে দেখাবে?'

'তা আশা করিনি। তবে একজন গাইড তো থাকতে পারতো!'

'এই দুর্গম বনে গাইড দূরে থাক গত পাঁচ বছরে আমরা ছাড়া আর কেউ এসেছে বলে তো বোঝাও যাচ্ছে না।'

শীলা হেসে বললো, 'রাত পর্যন্ত থাকলে রনির অতৃপ্ত আত্মাদের কাউকে বলতে পারি আমাদের গাইড হয়ে দুর্গটা ঘুরিয়ে দেখাতে।'

'কোনো দরকার নেই।' শীলার কথা শুনে রনিও হাসলো—'এর চেয়ে নিচে গিয়ে স্যান্ডউইচ খেতে বেশি ভালো লাগবে।'

স্বপনের ক্ষিদে পেলেও এত সুন্দর জায়গাটা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। দুপুরের ঝকঝকে রোদ গায়ে মেখে মস্ত এক কার্পেটের মতো বিছানো রয়েছে বাভারিয়ার ঢেউ খেলানো বন। ঘন সবুজ কার্পেটের ভেতর মাঝে মাঝে কাচের টুকরোর মতো ছড়িয়ে রয়েছে ছোট বড় রূপোলি রঙের হ্রদ। দূরের ধূসর নীল পাহাড়গুলো মনে হচ্ছে দক্ষ শিল্পীর আঁকা জলরঙের ছবির মতো। আকাশে টুকরো টুকরো সাদা মেঘ ছড়িয়ে আছে। হালকা বাতাসে শীতের আমেজ। শীলা আপন মনে বললো, 'এখানে কিছুক্ষণ থাকলে মনটাকে পবিত্র মনে হয়।'

রনি বললো, 'কথাটা শহরের লোকজন শুনতে পেলে দলে দলে ছুটে আসবে মন পবিত্র করার জন্য।'

স্বপনের হঠাৎ মনে পড়লো ডালমানের কথা। বললো, 'বেচারা ডালমান, কার দুর্গকে শার্লেমানের ভেবে স্যুটিং শুরু করে দিয়েছে কে জানে!'

শীলা বললো 'ইচ্ছা করলে আমরা ফুর্সটেনেকের দুর্গটা দেখে আসতে পারি। কে জানে ডালমান হয়তো ভুল করে ওটাকেই শার্লেমেনের দুর্গ ভেবে বসে আছে!'

'আসলে ওটা কবেকার দুর্গ?' জানতে চাইলে রনি।

'তাও দুশ' বছরের কাছে হবে।'

'তোমার দরকার মতো গাইডও পাওয়া যাবে ওখানে। এখান থেকে হেঁটেও যাওয়া যায়। যাবে নাকি?'

'কেন যাবো না? পুরোনো দুর্গ দেখতে আমার ভালো লাগে।'

'যদি না সেখানে আত্মাদের উৎপাত না থাকে!'

স্বপনের কথা শুনে শীলা শব্দ করে হেসে উঠলো। রনির মনে হলো কোথাও বুঝি জলতরঙ্গ বেজে উঠেছে।

স্বপন উঠে দাঁড়িয়ে হাত পা মেলে কয়েকটা হালকা ব্যায়াম করে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিলো। রনিকে বললো, 'এমন তাজা বাতাস জার্মানির আর কোথাও পাবে না।'

'আমার এখন দরকার তাজা লাঞ্চ প্যাকেট। পেটের ভেতর কাঠবেড়ালি ছুটোছুটি করছে।'

স্বপন মৃদু হেসে বললো, 'চলো তাহলে।'

ওপরে উঠতে যত সময় লেগেছিল নিচে নামতে অর্ধেক সময়ও লাগলো না। বলতে গেলে ওরা একরকম দৌড়েই নামলো। ওক গাছের নিচে গাড়িটার কাছে সবার আগে ছুটে গেল স্বপন। গাড়ির ওপর নজর পড়তেই চমকে উঠলো ও। পরিষ্কার মনে আছে নিজের হাতে দরজা বন্ধ করেছিল, অথচ এখন দরজা খোলা।

গাড়ির কাছে গিয়ে স্বপন চিৎকার করে ডাকলো, 'শীলা, রনি জলদি এসো।'

স্বপনের ডাক শুনে ওরা দুজন ছুটে গেল। গাড়ির ভেতর তাকিয়ে ওরাও হতবাক হয়ে গেল। পেছনের সিটের ওপর ওদের তিনজনের জন্য ফয়েল পেপার দিয়ে যত্ন করে তিনটা লাঞ্চ প্যাক বানিয়ে দিয়েছিল মার্থা। তিনটা প্যাকেটই কর্পূরের মতো হাওয়া হয়ে গেছে। ওরা তিনজন একে অপরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলো। কয়েক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বলতে পারলো না। নীরবতা ভেঙে শীলা প্রথম বললো, 'কেউ চুরি করেছে আমাদের খাবার।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি।' স্বপনের গলায় তখনও বিস্ময়ের রেশ—'এখানে তো কারও থাকার কথা নয়।'

রনি বললো, 'নিশ্চয় জিপসিদের কাজ। বোধহয় কাছে ধারে কোথাও ওরা তাঁবু গেঁড়েছে।'

কবে কোন কালে এশিয়া থেকে জিপসিরা ইউরোপে গিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে তার কোনো হিসেব নেই। কোথাও স্থায়ীভাবে থাকে না। দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। নানারকম জাদু দেখিয়ে হাত দেখে ভাগ্যের কথা বলে, কখনও ছোট খাট সার্কাস দেখিয়ে নয়তো অদ্ভুত সব পাথর আর শেকড় বাকড় বিক্রি করে নিজেদের সংসার চালায়। মাঝে মাঝে জিপসিদের কেউ ছোট খাটো চুরি চামারিও করে। কয়েক শ বছর ধরে

জার্মানিতে থাকলেও বেশির ভাগ জার্মান এদের দু'চোখে দেখতে পারে না, জার্মানদের সঙ্গে মেলামেশা করতে গিয়ে রনিরও ধারণা জিপসিরা ছাড়া আর কেউ চুরি করে না।

শীলা জন্মসূত্রে জার্মান হলেও মায়ের প্রভাবে ওর স্বভাব সাধারণ জার্মানদের মতো নয়। রনির কথা শুনে গম্ভীর হয়ে বললো, 'জিপসিরা লোকালয়ের আশে পাশে থাকে। এরকম গভীর বনে জিপসি থাকার কোনো কারণ নেই।'

স্বপন বললো, 'প্যাকেটগুলো তাহলে নিলো কে?

'গাড়ির দরজা খোলা ছিল। বুনো কুকুর কিংবা শেয়াল নিতে পারে।'

'দরজা আমি নিজের হাতে বন্ধ করেছি।

'এখন মনে হচ্ছে করেছো। আসলে হয়তো করোনি।'

'আমার পরিষ্কার মনে আছে আমি দরজা বন্ধ করেছি।

শীলা আর স্বপনের কথার মাঝখানে রনি বললো, 'দরজা বন্ধ করেছো কি করোনি এ নিয়ে তর্ক করলে ক্ষিদে যাবে না। তার চেয়ে তাড়াতাড়ি ফুর্সটেনের চলো। ওখানে গিয়ে লাঞ্চ করবো।'

কথা না বাড়িয়ে স্বপন গাড়িতে গিয়ে বসলো। রনি বসলো ওর পাশে আর শীলা পেছনে। চাবি ঘুরিয়ে গাড়ি স্টার্ট নিতে গিয়ে আরেক বিপত্তি। বার বার চেষ্টা করেও গাড়ির স্টার্ট নিতে পারলো না স্বপন। ইন্ডিকেটারে চোখ পড়তেই চমকে উঠলো—'এ কি! এক ফোঁটা ফুয়েল নেই গাড়িতে!'

শীলা এবার বিরক্ত হয়ে বললো, 'বাড়ি থেকে বেরোবার সময় তুমি ফুয়েল চেক করবে না?'

'পরশু সন্ধ্যায় আমি বাইশ লিটার ফুয়েল নিয়েছি। আমার হিসেব মতো এখন বারো লিটারের বেশি থাকা কথা।'

রনি বললো, 'ট্যাঙ্কের কোথাও লিক টিক কিছু করেনি তো?'

স্বপন উঠে গাড়ির তলা দেখলো। তারপর ট্যাঙ্কের ঢাকনিটা আলগা দেখেই যা বোঝার বুঝে ফেললো। গম্ভীর হয়ে বললো, 'যে বা যারা আমাদের লাঞ্চ প্যাক নিয়েছে তার ট্যাঙ্ক খালি করে ফুয়েলও নিয়ে গেছে।'

'এমন বিরান জঙ্গলে কে আসবে খাবার আর গাড়ির ফুয়েল নেয়ার জন্য?' চিন্তিত গলায় বললো শীলা।

'যেই আসুক, লোক ভালো নয়। আমাদের বিপদে ফেলার মতলবেই এসব করেছে।' স্বপনের গলায় বিরক্তির ঝাঁঝ।

'ফেলতে চাইলেই আমরা পড়বো নাকি। খুঁজে বের করতে হবে কারা এসব শয়তানি করছে।'

রনি শুকনো গলায় বললো, 'তোমরাই বলছো এমন গভীর বনে কোনো মানুষজন আসতে পারে না। আমার ভয় হচ্ছে—এসব হয়তো কোনো অশরীরী আত্মার কাজ।'

'আত্মারা কবে থেকে লাঞ্চ খাওয়া শুরু করলো রনি?' অবাক হয়ে বললো শীলা, 'ফুয়েল দিয়েই বা ওরা কী করবে? আত্মারা নিশ্চয় ড্রাইভ করে না?'

'এ জায়গাটা আমার ভালো লাগছে না। দূর যখন বেশি নয় ফুর্সটেনেক তো আমরা হেঁটেই যেতে পারি।' শীলার রসিকতা উপেক্ষা করলো রনি।

'হাঁটা ছাড়া উপায়ও নেই।' অসহায় ভাবে হাসলো স্বপন।

গাড়ির দরজা লক করে ওরা তিনজন জঙ্গলের ভেতরের সরু রাস্তা ধরে ফুর্সটেনেকর পথে পা বাড়ালো।

অতৃপ্ত আত্মার রোষানলে

মিনিট পনেরো না হাঁটতেই রনি শুকনো গলায় বললো, 'আমরা ঠিক পথে যাচ্ছি তো স্বপন? আমার কাছে সব কিছু কেমন যে গোলমেলে মনে হচ্ছে!'

'গোলমেলে মনে হচ্ছে কেন?' স্বপনের মুখে মৃদু হাসি—'মিনিট দশ পনেরো পরেই ইল্‌য্‌ নদীর তীরে পৌছে যাবো আমরা। সেখান থেকে ফুর্সটেনেক মাত্র তিন কিলোমিটার।'

'টিটলিঙের ঘটনাগুলো সম্পর্কে কিছু ভেবেছো তোমরা?' হাঁটতে হাঁটতে গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলো রনি।'

'কী ভাববো?'

'দূর্গের পাহাড় বেয়ে উঠতেই আমাদের লক্ষ্য করে বড় বড় পাথরের টুকরো ছোঁড়া হলো। আমাদের উপোষ রেখে মারার জন্য খাবারগুলো সরিয়ে নিলো। যাতে এখানে আটকা পড়ি—ফুয়েল চুরি করে গাড়িটাকে অকেজো করে দিলো। এ সবের ভেতর একটা যোগসূত্র আছে।'

'তুমিই তো বললে জিপসিদের কাজ হতে পারে।'

'বলেছিলাম। এখন মনে হচ্ছে জীবিত মানুষের জন্য নিষিদ্ধ কোনো জায়গায় এসে পড়েছি আমরা। এখানকার বাসিন্দাদের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটিয়েছি।'

'আমার ধারণা কোনো খারাপ লোক আমাদের ভয় দেখিয়ে মজা পেতে চাইছে।' রনির ধারণার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করলো শীলা।

'বার বার লোক লোক করছো কেন? এই জঙ্গলে আমাদের ভয় দেখাবার জন্য লোক আসবে কোত্থেকে?'

'গ্রাম থেকে আসতে পারে। চোর, গুণ্ডা, স্মাগলার হতে পারে। আমরা থাকলে হয়তো ওদের কাজের ব্যাঘাত ঘটবে মনে করছে।'

'চোর, গুণ্ডা যদি থেকেও থাকে তারা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে আমরা যে এখানে থাকতে আসিনি। আমাদের না তাড়ালেও আমরা চলে যেতাম।'

'তোমার আত্মাদেরও তো বোঝা উচিৎ ছিল আমরা থাকতে আসিনি।' বলে মুখ টিপে হাসলো শীলা।

'আত্মাদর নিয়ে ইয়ার্কি কোরো না শীলা। ওরা রেগে গেলে মানুষের অনেক ক্ষতি করতে পারে।'

'ঠিক আছে। আমরা তো চলেই যাচ্ছি। টিটলিঙের দুর্গে শান্তিতে থাকুক তোমার আত্মারা। আমরা আর ওদের বিরক্ত করবো না।'

'গাড়ি নেয়ার জন্য তো আসতে হবে।'

'তাও তো কথা।' গম্ভীর হওয়ার ভান করলো শীলা—'আত্মাদের শান্তির ব্যাঘাত না ঘটিয়ে গাড়িটা কিভাবে আনা যায় বলতো?'

'ভালো হয় আমরা আবার টিটলিঙে আসার সময় সঙ্গে যদি কোনো ওঝা নিয়ে আসি।'

'কোথায় পাবো ওঝা?'

'ওঝা না পেলে গির্জার ফাদার যদি রাজী হন তাহলেও চলবে।'

স্বপন হেসে বললো, 'ঠিক আছে রনি। ফুর্সটেনেকের গ্রামে গিয়ে ওঝা খুঁজে বের করা যাবে। তার আগে পেটে যে ক্ষিদের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে সেটা নেভানো দরকার।'

ওরা ততক্ষণে বাভারিয়ার বন থেকে বেরিয়ে ইল্‌য্‌ উপত্যকায় এসে পড়েছে। সরু ইল্‌য্‌ নদীর দু'পাশে খানিকটা ঘাস বিছানো সমতল জমি, তারপর খাড়া পাহাড় উঠে গেছে। পাহাড়ের গায়ে পাইন ফার আর নাম না জানা গাছের সমারোহ।

বাইরে থেকে টুরিস্টরা এদিকে এলে ইল্‌য্‌ উপত্যকায় হেঁটে বেড়াবার লোভ কেউ সামলাতে পারে না। সেদিন সারাটা পথে ওরা একজন টুরিস্টের দেখাও পেলো না। দুপুর দুটো নাগাদ ওরা ফুর্সটেনেক গিয়ে পৌঁছলো। সূর্য তখনই পশ্চিমে হেলে পড়েছে। মাঝে মাঝে আল্পস—এর ওপর থেকে আসা কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসও বইছে।

ফুর্সটেনেকেরে দুর্গের পাশেই ছোট একটা রেঁস্তোরা রয়েছে টুরিস্টদের জন্য। ইলয নদী থেকে ধরা তাজা ট্রাউট মাছ ভাজা, সসেজ আর ঘরে বানানো বাদামি পাউরুটি দিয়ে ওরা দুপুরের খাবার সারলো। সঙ্গে ঘরে তোলা কাঁচা মাখনও ছিল পর্যাপ্ত।

রেঁস্তোরাঁয় ওরা ছাড়া মাত্র দু'জন ধর্মযাজক ছিলেন খদ্দের হিসেবে। ওরা ঢোকার পাঁচ মিনিট পরই ওঁরা এসে রেস্তোরাঁয় ঢুকেছেন। খেতে খেতে রনি

ওঁদের দিকে ইশারা করে বলেছিল, 'দেখে তো মনে হচ্ছে গির্জার পাদ্রী। ওঝার কথা জিজ্ঞেস করবো নাকি?'

মজা দেখার জন্য স্বপন গম্ভীর হয়ে জবাব দিয়েছে—'বলে দেখতে পারো।'

ধর্মযাজক দু'জন খাওয়া শেষ করে কফির অর্ডার দিয়েছেন। রনি নিজেদের টেবিল থেকে উঠে এসে অভিবাদন জানিয়ে বললো, 'কিছু যদি মনে না করেন, আপনারা কি এ গ্রামে থাকেন?'

দু'জনের ভেতর বয়স্ক যিনি, চুলদাড়ি যাঁর সব সাদা হয়ে গেছে, একটু অবাক হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, কেন?'

'আমরা একজন ভালো ওঝা খুঁজছি।'

'ওঝা কি জন্য?'

'আজ সকালে আমরা টিটলিঙের দুর্গে গিয়েছিলাম। সেখানে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে, যাতে আমাদের মনে হয়েছে কোনো অতৃপ্ত আত্মা কিংবা কোনো অশুভ শক্তি সেখানে আছে। কেউ গেলে বিপদ হতে পারে।'

'কীভাবে বুঝলে ওখানে অশুভ শক্তি আছে?'

টিটলিঙের দুর্গে যাওয়ার পর থেকে অস্বাভাবিক যেসব ঘটনা ঘটেছে রনি সব খুলে বললো ধর্মযাজকদের। ওর কথা শুনে ওঁরা দু'জনই বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন। বুড়ো ফাদার বললেন, 'খুবই ভাবনার কথা। ঠিক আছে। বাছা! আমার পরিচিত এক ওঝা আছে। ও মুনসেন গেছে এক খারাপ আত্মাকে তাড়াবার জন্য। কাল নয়তো পরশু ফিরবে। এলে ওকে বলবো টিটলিঙ যেতে।'ফাদারকে ধন্যবাদ জানিয়ে রনি টেবিলে ফিরে এল। স্বপন আর শীলা অতি কষ্টে হাসি চেপে বসেছিল। দারুণ এক কাজ করে ফেলেছে—এমন এক মুখের ভাব করে রনি বললো, 'শুনলে তো, সব ব্যবস্থা করে ফেললাম।'

স্বপন গম্ভীর হওয়ার ভান করে জানতে চাইলো, 'পুরোনো দুর্গে খারাপ আত্মা থাকে, ওদের ওঝা দিয়ে তাড়াতে হয়, এত কিছু তুমি জানলে কোত্থেকে রনি?'

'জানতে চাইলেই জানা যায়। আমাদের স্কুলের লাইব্রেরিতে উইচক্রাফট আর ব্ল্যাক আর্টের ওপর অনেক বই আছে।'

শীলা নিরীহ গলায় বললো, 'আমিও কিছু পড়েছি। আমার ধারণা ছিল এসব আত্মা—ফাত্মারা রাতে বেরোয়। টিটলিঙ না গেলে জানতেই পারতাম না দিন দুপুরে ভূত এসে স্যান্ডউইচ খায়।'

'খেতে নিশ্চয় দেখোনি তুমি। ওরা খেয়েছে কে বললো? ফেলে দিয়েছে কোথাও। ওরা যদি কারও ওপর ভর করে তাহলে তাকে দিয়ে দিনেও অনেক কিছু করিয়ে নিতে পারে।

স্বপন চিন্তিত গলায় বললো, 'গাড়িটা যে রেখে এলাম—পাজি আত্মারা ওটা নিয়ে আবার না বর্ডারের ওপারে বেচে দিয়ে আসে।'

স্বপনের কথায় রনির সন্দেহ হলো ও আর শীলা আত্মা নিয়ে রসিকতা করছে। গম্ভীর হয়ে বললো, 'আত্মা কেন তোমার গাড়ি চুরি করতে যাবে?'

'ফুয়েল চুরি করেছে, লাঞ্চ প্যাক চুরি করেছে, গাড়ি চুরি করতে কতক্ষণ! ওরা জানে গাড়িটা লোপাট করতে পারলে আমরা এ জীবনে আর টিটলিঙ দুর্গের ধারে কাছে যাবো না।'

'ওঝা যখন পাচ্ছি না—সূর্য ডোবার আগেই গাড়িটা ওখান থেকে উদ্ধার করা দরকার।'

'চলো তাহলে। কে জানে কপালে কী আছে।' হাসি চেপে স্বপন আর শীলা উঠে দাঁড়ালো। পাদ্রীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রনিও বেরিয়ে এল রেঁস্তোরা থেকে।

পেট্রল পাম্প থেকে দশ লিটারের দুটো জেরিকেন আর মোবিল নিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়লো টিটলিঙের পথে। সূর্য ততক্ষণে আরও কিছুটা হেলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে। রনি হিসেব করে দেখলো সূর্য ডোবার আগেই ওরা টিটলিঙ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে।

ইল্‌য্‌ নদীর তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে স্বপন ভাবছিল রনিকে নিয়ে ভাঙা দুর্গের ভেতরে নিয়ে একবার ভয় দেখিয়ে ওর মাথা থেকে ভূতের ভয় তাড়াতে হবে। দিনের আলো থাকতে থাকতে টিটলিঙ পৌছানোর জন্য রনি আগে আগে পা চালিয়ে হাঁটছিল আর মাঝে মাঝে ওদের তাড়া দিচ্ছিল জলদি হাঁটার জন্য। স্বপন একটা ফন্দি বের করে কথাটা শীলার কানে কানে বললো। শীলাও মুখ টিপে হেসে ওকে সমর্থন জানালো।

নদীর তীর ছেড়ে ওরা বনের ভেতরের পথে উঠতে যাবে এমন সময় টিটলিঙ থেকে আসা এক জিপসি পরিবারের মুখোমুখি হলো ওরা। দু'জন সাদাচুলো বুড়ো বুড়ি, তাদের সঙ্গে মাঝ বয়সী দু'জন পুরুষ আর মহিলা, সঙ্গে চার থেকে আট বছরের গোটা চারেক ছেলে মেয়ে। একটা বেতো ঘোড়ার পিঠে পোটলা—পুটলি বোঝাই করে ওরা ফুর্সটেনেকের দিকে যাচ্ছিল। স্বপন অমায়িক গলায়—'গুটেন্‌টাখ উনকেল বলে বুড়োকে সম্বোধন করে বললো, 'আপনারা কি টিটলিঙ থেকে আসছেন?'

বুড়ো সন্দেহভরা চোখে স্বপনকে দেখলো। জার্মানরা কখনও এত অমায়িক গলায় ওদের সঙ্গে কথা বলো না। ভুরু কুঁচকে বললো, 'রাস্তা যখন টিটলিঙের—ওখান থেকেই তো আসবো! তোমরা কারা?'

'আমাদের দেশ অনেক দূরে। ইন্ডিয়ার পাশে বাংলাদেশ নামে একটা ছোট্ট দেশ আছে। এখন আমরা জার্মানির বাসিন্দা, বাড়ি ডেগেনডর্ফে।'

'ইন্ডিয়া!' কথাটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে বুড়োর ঘোলাটে চোখ দুটো চকচক করে উঠলো—'আমাদের পূর্ব পুরুষ ইন্ডিয়া থেকে এসেছিল। তোমরা কি ইন্ডিয়া গিয়েছো। কখনও?'

রনিকে দেখিয়ে স্বপন বললো, 'ও গিয়েছে, আমরা দুজন আগামী বছর যেতে পারি।'

'ভারি খুশি হলাম তোমাদের দেখে।' এই বলে বুড়ো ওদের সঙ্গে হাত মেলালো। বুড়োর দেখাদেখি অন্যরাও এগিয়ে এসে স্বপনদের সঙ্গে হাত মেলালো।

'আমার নাম আফেন্দি। আমার বুড়ির নাম বুর্নিলদা। আমার ছেলে ইম্ফান আর ওর বউ। এই পাজিগুলো নাতি নাতনি।' পরিবারের সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বুড়ো জানিতে চাইলো—'অসময়ে তোমরা টিটলিঙ যাচ্ছো কেন? এটা তো টিটলিঙ ছেড়ে আসার সময়।'

'অসময় কেন হতে যাবে? টুরিস্ট সিজন এখনও তো শেষ হয়নি।'

শুকনো মুখে বুড়ো আফেন্দি বললো, 'তোমরা কি জানো না বাছা সূর্য ডোবার পর বাইরের কেউ টিটলিঙ থাকে না?'

'জানি না তো! কেন সূর্য ডোবার পর কী হয় ওখানে?'

'শার্লেমানের দুর্গ থেকে অশরীরী আত্মারা নেমে আসে গ্রামে। বাদুড়ের রূপ ধরে ঘুরে বেড়ায়। কাউকে বাগে পেলে ঘাড়ে দাঁত ফুটিয়ে দিয়ে রক্ত শুষে খায়।'

আফেন্দির কথা শুনে রনির চেহারা কাগজের মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেল। স্বপন জানে জিপসিদের মাথা নানা রাজ্যের কুসংস্কার আর অন্ধ বিশ্বাসে ঠাসা থাকে। বললো, 'আপনারা কি আজ সারাদিন টিটলিঙ ছিলেন?'

'আজ নয়, কাল এসেছিলাম। উঠেছিলাম আমাদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে। শুনলাম ইদানিং নাকি ওদের উৎপাত বেড়েছে। দিনেও কেউ দুর্গের আশেপাশে যেতে চায় না।'

'কী সর্বনাশ!' ভয় পাওয়ার ভান করলো স্বপন—'আমরা যে গাড়ি রেখে এসেছি! এখন কী হবে।'

আকাশের দিকে তাকিয়ে সূর্যের অবস্থান দেখলো আফেন্দি। তারপর বললো, 'যদি পা চালিয়ে যাও আধঘন্টার ভেতর টিটলিঙ পৌঁছতে পারবে। সূর্য ডুবতে আরও এক ঘন্টা। চলি বাছারা, ঈশ্বর তোমাদের রক্ষা করবেন।'

বনের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে স্বপন শীলাকে বললো, 'রনির কথা কিভাবে ফলে গেল দেখলি?'

'কোন কথা?' অবাক হয়ে জানতে চাইলো শীলা।

'রনি কিন্তু প্রথমেই বলেছিল জিপসিরা আমাদের লাঞ্চ প্যাক চুরি করেছে। আফেন্দি বুড়োর পরিবার কাল থেকে টিটলিঙ ছিল। তার ছেলেটার চেহারা দেখে খুব একটা ভালো মানুষ মনে হলো না।'

রনি বললো, 'প্রথমে জিপসিদের কথা মনে হলেও পরে আমি অন্য কথা বলেছি। আফেন্দিদের কথা শোনার পরও কি তোমরা বিশ্বাস করবে না?'

স্বপন হাল ছেড়ে দিয়ে বললো, 'এত করে যখন বলছো, বিশ্বাস না করে উপায় কি! ঈশ্বর জানেন গাড়িটার কী হাল করেছে ওরা!'

'কে জানে, আমাদের রক্ত শুষে খাওয়ার জন্য গাড়িটা হয়তো এতক্ষণে ভ্যানিশ করে দিয়েছে।' হাসি চেপে মন্তব্য করলো শীলা।

'সেক্ষেত্রে গ্রামের কারও বাড়িতে রাত কাটাতে হবে।'

'জানো না বুঝি!' কথাটা হঠাৎ মনে পড়ায় শীলা খুশিভরা গলায় বললো, 'আমি একটা বইয়ে পড়েছি, যে সব গ্রামে ভ্যাম্পায়ারদের উৎপাত আছে, সেখানে রাতে কেউ অচেনা লোকদের আশ্রয় দেয় না।'

'কেন, দিলে কী হয়?' জানতে চাইলো স্বপন।

'ভ্যাম্পায়াররা শুধু বাদুড়ের রূপ ধরে না। তারা মানুষের রূপ ধরেও আসে।'

'কী বিপদ!' স্বপন চিন্তিত গলায় রনিকে বললো, 'এখন কী হবে রনি?'

'আমি একটা বুদ্ধি বের করেছি।' কৌতুক মেশানো গলায় বললো শীলা।

'কী বুদ্ধি?'

'ভ্যাম্পায়াররা রসুনের গন্ধ সহ্য করতে পারে না।' এসব গ্রামের লোকেরা ভ্যাম্পায়ার তাড়াবার জন্য দরজা জানালায় রসুনের মালা ঝুলিয়ে রাখে। আমরা তিনজন গ্রামের দোকান থেকে তিনটা রসুনের মালা গলায় ঝুলিয়ে আশ্রয় চাইতে যাবো। এতেই প্রমাণ হবে আমরা ভ্যাম্পায়ার নই।'

'শুনেই আমার বমি আসছে।' স্বপন নাক কুঁচকে বললো, 'রসুনের গন্ধ আমি সহ্যই করতে পারি না।'

'উপায় নেই।' গম্ভীর হওয়ার ভান করলো শীলা—'গ্রামের লোক যদি এ ধরনের কথা শোনে নির্ঘাত তোমাকে ওরা ভ্যাম্পায়ার ভেবে পুড়িয়ে মারবে।'

'পুড়িয়ে মারবে কেন? পুড়িয়ে মারে তো ডাইনিদের। আমাকে বোধ হয় সিলভার বুলেট দিয়ে গুলি করে মারবে।'

'হলো না!' হেসে ফেললো শীলা—'সিলভার বুলেট দিয়ে অয়্যারউলফকে মারে। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ভ্যাম্পায়ারদের বুকে কাঠের ক্রস পুঁতে দিয়ে মারে।'

'কী সাংঘাতিক!' স্বপন আঁতকে ওঠার ভান করলো। 'মৃত্যুটা তাহলে খুবই কষ্টের হবে শীলা।'

'কী সব আজে বাজে কথা বলছো তোমরা।' রনি একটু বিরক্ত হয়ে বললো, 'তোমাদের কতবার বলবো ওদের নিয়ে রসিকতা করবে না? এতে ওরা আরও রেগে যেতে পারে।'

'শীলা তুমি ওদের বেশি রাগিয়ে দিচ্ছো। ক্রস—ট্রসের কথা ঘুর্ণাক্ষরেও উচ্চারণ করবে না। জানো না ওরা যে ক্রস পছন্দ করে না?'

'তোমার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবো।' অতি কষ্টে হাসি চেপে গম্ভীর গলাফ জবাব দিলো শীলা।

গাড়িটা যেখানে ছিল সেখানেই আছে। দেখে ওরা তিনজনই স্বস্তি বোধ করলো। গাড়িতে ফুয়েল ঢালতে ঢালতে স্বপন হাসি চেপে বললো, শীলা, রনি ঝটপট উঠে পড়ো। সূর্য ডোবার আগেই টিটলিঙ ছাড়তে হবে আমাদের।'

শীলা বললো, 'এত তাড়া কিসের। এখনও চল্লিশ মিনিট সময় আছে হাতে। এখান থেকে সূর্যাস্ত দেখার মজাই আলাদা।'

রনি আঁতকে উঠে বললো, 'না শীলা। এই অশুভ জায়গায় আমি এক মুহূর্তও থাকতে চাই না। প্লিজ, আর দেরি কোরো না।'

'ঠিক আছে চলো।' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ নাচিয়ে শীলা গাড়িতে উঠে বসলো।

স্বপন ওর জায়গায় বসে ড্রাইভিং বেল্টটা ঠিক করে চাবি ঘোরালো। ইঞ্জিন স্টার্ট হলো না। এক্সিলেটার বার বার চাপ দিয়ে চেষ্টা করলো, কোনো লাভ হলো না। ওর কপালে বিরক্তির ভাঁজ পড়লো।

শীলা হাসি চেপে রনিকে দেখছিল। উৎকণ্ঠায় রনির চেহারা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। এখানে আসার পথে স্বপন ওর কানে কানে বলেছিল রনিকে ভয় দেখাবার জন্য ও ইচ্ছা করে গাড়িটা অকেজো করে রাখবে। রাত হলে দেখিয়ে দেবে অশুভ আত্মা, ভ্যাম্পায়ার এসব একেবারে বাজে কথা। ওয়ালেট ফেলে

এসেছে বলে রাতে দুর্গের চত্বর থেকে ঘুরে আসবে। তারপর ধীরে সুস্থে গাড়ি মেরামত করার ভান করে ঝামেলা মিটিয়ে বাড়ি ফিরবে। রনির ভয় ভাঙাবার জন্যই এরকম একটা প্ল্যান এঁটেছিল স্বপন। শীলাও তাতে সায় দিয়েছিল।

বেশ কয়েকবার স্টার্ট নেয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে স্বপন যখন বিরক্ত হয়ে উঠছিল শীলা তখন উদ্বিগ্ন হওয়ার ভান করে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে স্বপন। খারাপ আত্মাদের নজর পড়েনি তো?'

স্টিয়ারিং—এর ওপর একটা ঘুষি মেরে বিরক্তি মেশানো গলায় স্বপন বললো, 'ঠাট্টা নয় শীলা! গাড়ি সত্যি সত্যি খারাপ হয়েছে।'

বনেট খলে ইঞ্জিন পরীক্ষা করলো স্বপন। শীলা মনে মনে প্রমাদ গুনলো। গাড়ি যদি সত্যিই বিগড়ে যায়, রাতে বাড়ি ফেরা হবে না। বাবা, মার ভীষণ দুশ্চিন্তা হবে। রনির হার্টবিট এমনই বেড়ে গেছে যে ওর মনে হচ্ছিলো যে কেনো সময় ওটা বন্দ হয়ে যাবে। ভাঙা গলায় বললো, 'কী হয়েছে স্বপন, কিন্তু বুঝতে পারলে?'

বনেতের তলায় মাথা নিচু করে ইঞ্জিন পরীক্ষা করতে করতে স্বপন বললো, 'মনে হচ্ছে কার্বুরেটরে ময়লা জমেছে।'

'এখন তাহলে কী হবে?'

'একজন মেকানিক লাগবে'। বনেত বন্ধ করে রুমালে হাত মুছতে মুছতে স্বপন বললো, 'চলো, গ্রামের দিকে যাই।'

শীলা আর রনি ঝটপট গাড়ি থেকে নেমে পড়লো।

সূর্য ডোবার আর বেশি দেরি নেই। সারা আকাশ লাল রঙে ছেয়ে গেছে। পুব আকাশে থরে থরে সাজানো ধূসর রঙের মেঘের চারপাশে লাল ছোট গোটা পরিবেশকে করে তুলেছে রহস্যময়। ধূসর মেঘে ভরা লাল আকাশের পটভূমিতে শার্লেমানের ভাঙা দুর্গের উঁচু পাহাড়টাকে খুবই অচেনা মনে হচ্ছে।

ঘন ফার গাছে ঢাকা মিনিট পনেরোর রাস্তা পার হতেই দূরে লোকজনের ঘরবাড়ি চোখে পড়ে। যেতে যেতে রনি বললো, 'শীলা যে বলেছিলে এসব গ্রামে ঢোকার আগে রসুনের মালা সঙ্গে রাখতে।'

শীলা বিরক্তি চেপে বললো, 'এখানে রসুন কোথায় পাবে?'

'বা রে! তুমিই তো বলেছিলে গ্রামের মানুষ অচেনা লোকজনদের সন্দেহের চোখে দেখে।'

'আগে তো গ্রামে যাই! পরে দেখা যাবে।'

স্বপন ভাবছিল মেকানিক জোগাড় না হলে বাড়িতে ফোন করে জানাতে হবে।

গ্রামে কোথাও রাত কাটাবার ব্যবস্থা করতে হবে। রনিকে নিয়ে হয়েছে আরেক বিপদ। ভয়ের চোটে কখন মুর্ছা যায় কে জানে!

ফার বনের সীমানা পেরিয়ে প্রথম যে বাড়িটা ওদের চোখে পড়লো সেটা বেশ অবস্থাপন্ন এক চাষির।

বাইরের কাঠের দরজা দিয়ে ঢুকে বেশ খানিকটা ফাঁকা জমি পেরিয়ে বাড়ির কাছে এসে স্বপন গলা তুলে ডাকলো, 'বাড়িতে কেউ আছেন?'

ওর গলা শুনে বাড়ির ভেতর থেকে ঘেউ ঘেউ করে উঠলো গ্রে হাউন্ড কুকুর। ভারী গলায় ওকে ধমক দিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এল মাঝবয়সী বিশাল দেহী বদমেজাজী চেহারার এক লোক। ওদের তিনজনকে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো—'তোমরা কারা? কোত্থেকে এসেছো?'

'আমরা ডেগেনডর্ফ থাকি। সকালে এখানে এসেছিলাম টিটলিঙের দুর্গ দেখতে। দুপুরে গাড়ি রেখে গিয়েছিলাম ফুর্সটেনেক। ফিরে এসে দেখি গাড়ির ইঞ্জিন বিকল হয়ে গেছে।'

'টিটলিঙের দুর্গে দেখার কী আছে? তোমরা কি জানো না টুরিস্টদের ওখানে যাওয়া বারণ?'

'জানি না তো!' অবাক হয়ে বললো স্বপন—'কারা বারণ করলো? কেন?'

লোকটা রুক্ষ গলায় বললো, 'আমরা অতৃপ্ত আত্মার রোষানলে পড়তে চাই না। আমরা চাই না বাইরে থেকে অচেনা লোকজন এসে শার্লেমানের পবিত্র দুর্গ অপবিত্র করুক।'

'পাঁচ বছর আগেও আমরা দুর্গ দেখতে এসেছিলাম। তখন তো এরকম কথা শুনিনি?'

'তখন শোননি কী হয়েছে! এখন তো শুনলে। এবার বিদায় হও।'

লোকটার কথা বলার ধরন স্বপনের পছন্দ হলো না। বললো, 'আমরা জানতে এসেছিলাম এখানে কোনো মোটর মেকানিক পাওয়া যাবে কি না। আর রাতে কোথাও থাকা যাবে কি না।'

'ওই দিকে স্তেফানের সরাইখানা আছে। সেখানে গিয়ে খোঁজ করোগে।' এই বলে লোকটা অভদ্রের মতো আর কোনো কথা না বলে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো।

মনে মনে লোকটাকে 'ছোটলোক' বলে গাল দিয়ে শীলা, রনিকে সঙ্গে নিয়ে স্বপন সরাইখানার পথে পা বাড়ালো।

শেষ বিকেলের সূর্য ততক্ষণে পশ্চিমের বার্চ বনের আড়ালে চলে গেছে। বনের ভেতর গাছের তলায় পরতে পরতে অন্ধকার জমতে শুরু করেছে। তবে পুব দিকের পাহাড়ের ওপরের অংশে তখনও বিষণ্ন লাল রোদ শুয়েছিল ক্লান্ত হয়ে।

গভীর রাতে কুকুরের কান্না

গ্রামের একেবারে উত্তর প্রান্তে ছিল ফুর্তিবাজ বুড়ো স্তেফানের সরাইখানা। স্বপনরা যখন সরাইখানার দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো স্তেফান তখন ওর নাতনির বয়সী এক মেয়ের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নাচছিল সরাইখানার বেশির ভাগ খদ্দেরই ছিল বুড়ো নয়তো আধবুড়ো। ছেলে ছোকরাদের জন্য টিটলিঙের জাদুঘরের পাশে ডিসকো ক্লাব আছে।

টেবিলে টেবিলে ফেনা ওঠা বিয়ারভরা মগ। খদ্দেরদের কেউ স্তেফানের নাচ দেখছিল, কেউ নিজেদের ভেতর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গল্প করছিল। এ্যাকর্ডিয়ান বাজাচ্ছিল নাচিয়ে মেয়েটির হবু বর। স্বপন, শীলা আর রনি কাউন্টারের পাশে রাখা উঁচু টুলে গিয়ে বসলো। কাউন্টারে বসা এক গুঁফো বুড়ো রনি আর শীলার গায়ের রঙ দেখে জিপসি ভেবে ভুরু কোঁচকালো। বেশ কিছুক্ষণ পর বাজনা থামলো। খদ্দেররা তালি বাজালো। স্তেফান ক্লান্ত হয়ে কাউন্টারের ভেতর এসে একগাল এসে বুড়োকে বললো, 'এখনও জোয়ান ছোকরাদের সঙ্গে বাজি ধরে নাচতে পারি।'

বুড়ো চোখের ইশারায় স্বপনদের দেখালো। স্তেফান অজার্মান খদ্দের দেখে মোটেই বিচলিত হলো না। হেসে বললো, 'টিটলিঙের নতুন অতিথি মনে হচ্ছে! কোত্থেকে আসা হলো?'

সকালে টিটলিঙে আসা আর গাড়ি খারাপ হওয়ার কথা বদমেজাজী চাষিকে যতটুকু বলেছিল স্তেফানকেও ততটুকু বললো স্বপন। তারপর যখন গাড়ি সারাবার জন্য মেকানিক চাইলো তখন স্তেফানের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। শুকনো গলায় বললো, 'মেকানিক একজন আছে বটে, ও এখন ওদিকে যাবে বলে মনে হয় না।'

'আমরা বেশি মজুরি দেবো। রাতের ভেতর ডেগেনডর্ফ ফিরে যেতে চাই।'

কাষ্ঠ হেসে স্তেফান বললো, 'হাজার মার্ক দিলেও গুস্তাভ এ সময় দুর্গের ত্রিসীমানায় যাবে না।'

'কেন গেলে কী হবে।'

স্তেফান অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো ওদের পাশে বসা গুঁফো বুড়োর দিকে। বিষণ্ন গলায় বললো জোয়াকিম, তুমিই বলো।'

গুঁফো জোয়াকিম চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, 'তোমাদের বুঝি কেউ বলেনি সন্ধ্যের পর দুর্গের এক মাইলের ভেতর যাওয়া বারণ!'

'না, বলেনি। আমরা পাঁচ বছর আগেও এই এই দুর্গে বেড়াতে এসেছি। ব্যাপারটা কি দয়া করে খুলে বলবেন?'

'পাঁচ বছর নয়, তিন বছর আগে থেকে এটা ঘটছে। দুর্গে অশুভ কোনো শক্তি আস্তানা গেড়েছে। কে জানে, শার্লেমানের আমলে যে সব স্যাক্সন বীরদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছিল তাদের অতৃপ্ত আত্মা কিনা। মোদ্দা কথা, না জেনে সন্ধ্যার পর যারাই দুর্গের আশেপাশে গেছে তারা কেউ জীবিত ফিরে আসেনি। পরদিন সকালে ডানিউবের তীরে তাদের রক্তশূন্য মৃতদেহ পাওয়া গেছে।।

স্তেফান চাপা গলায় বললো, 'গত তিন বছরে পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে এভাবে।'

কাঁপা কাঁপা গলায় রনি বললো, 'আপনারা কোনো ওঝাকে খবর দেননি?

'আমরা খবর দেইনি। নিজে থেকে এসেছিল মুনসেনের এক ওঝা। ওই পাঁচজনের ভেতর একজন ছিল সে।'

'আপনার সরাইখানায় কি রাতে থাকার ব্যবস্থা আছে?' প্রশ্ন করলো স্বপন।

'নিশ্চয়ই আছে' স্তেফানের মুখে হাসি ফিরে এল অসময়ে তিনজন খদ্দের পেয়ে। 'প্রত্যেকের জন্য কি আলাদা ঘর লাগবে?'

রনি ব্যস্ত গলায় বললো, 'আলাদা নয় আমরা এক ঘরের থাকবো।'

'তারও ব্যবস্থা করা যাবে। ডিনার করবে নিশ্চয়? ডিনার আর ব্রেকফাস্ট নিয়ে সত্তর মার্ক পড়বে।'

স্বপন মৃদু হেসে বললো, 'আপনি কি ডেগেনডর্ফের হোটেল জেরানিয়ামের নাম শুনেছেন?'

'কেন শুনবো না! ডেগেনডর্ফের সবচেয়ে বনেদি হোটেল।'

'আমার বাবা ওটার মালিক। জেরানিয়ামের তুলনায় আপনার ভাড়াটা একটু বেশি মনে হচ্ছে।'

একটু অপ্রস্তুত হয়ে স্তেফান বললো, 'আগে বলবে তো! ঠিক আছে, পঞ্চাশ মার্ক নিশ্চয় বেশি হবে না?'

'পঞ্চাশ মার্ক ঠিক আছে। আপনার এখান থেকে একটা টেলিফোন করতে চাই।'

'স্বচ্ছন্দে।' হাসিমুখে টেলিফোনটা কাউন্টারের ওপর তুলে দিলো স্তেফান।

বাড়িতে ফোন করে স্বপন মাকে জানিয়ে দিলো গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ায় ওরা টিটলিঙ থেকে যাচ্ছে। মা জানতে চাইলেন—'রাতে থাকছো কোথায়?'

'স্তেফানের সরাইখানায় মা। ভারি চমৎকার জায়গা। হের স্তেফানও চমৎকার মানুষ।' স্বপন লক্ষ্য করলো প্রশংসা শুনে স্তেফানের হাসি কান পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। বললো, 'ডালমানরা কি স্যুটিং থেকে ফিরেছে মা?'

'হ্যাঁ, এইমাত্র ফিরলো। রাতের খাবার ঘরে পাঠাবার কথা বলে ওপরে চলে গেল।'

'ঠিক আছে মা, রাখছি। কাল দুপুরের আগেই ফিরবো।' টেলিফোন শেষ করে স্বপন স্তেফানকে বললো 'আমরা ক্ষুধার্ত। সাপার সেরে ঘরে যাবো।'

'কী খাবে বলো। ভাপানো ট্রাউট আছে, বুনো খরগোশের রোস্ট আছে, সঙ্গে সব্জির সালাদ এ্যাসপারাগাস স্যুপ আর বাঁধাকপির আচার।'

'ট্রাউট দুপুরে খেয়েছি। খরগোশের রোস্ট আর সালাদ মন্দ হবে না।'

'টেবিলে গিয়ে বসো। পনেরো মিনিটের ভেতর খাবার দেয়া হবে।'

স্তেফান অর্ডার নিয়ে ভেতরে রান্নাঘরে গেল। স্বপনরা এক কোণে খালি টেবিল ঘিরে বসলো। শীলা ওর ভাইকে জিজ্ঞেস করলো—'মা কি আমাদের জন্য চিন্তিত ছিলেন?'

'চিন্তিত হবেন কেন? বলেই তো এসেছিলাম সন্ধ্যার আগে ফিরবো না।'

'ভ্যাম্পায়ারদের গ্রামে রাত কাটাবার কথা ভাবতেই রোমাঞ্চ হচ্ছে।'

'তুমি কি লক্ষ্য করেছো শীলা?' রনি বললো 'এদের সরাইখনার দরজা জানালার কোথাও রসুন ঝোলানো নেই।'

হাসি চেপে শীলা বললো, 'জোয়াকিমের কথা শোননি? অতৃপ্ত আত্মারা দুর্গের এক মাইলের বাইরে আসে না।'

'এখন থেকে দুর্গটা কত দূরে হবে মনে করো?'

স্বপন বললো, 'মাইল দুয়েকের কাছাকাছি হবে। তোমার কি এখানেও ভয় লাগছে?'

'না, ভয় লাগবে কেন?' শুকনো গলায় রনি বললো, 'ভ্যাম্পায়ারদের কথা শুধু বইতে পড়েছিলাম। এভাবে ভ্যাম্পায়ারদের গ্রামের রাত কাটাবো কখনও ভাবিনি।'

'ফিরে গিয়ে স্কুলের বন্ধুদের কাছে গল্প করতে পারবে।'

'ওরা বিশ্বাসই করতে চাইবে না।'

শীলা বললো, 'আমরা কেউ কিন্তু ভ্যাম্পায়ারদের দেখিনি এখন পর্যন্ত। শুধু লোকজনের মুখে ওদের কথা শুনেছি।'

স্বপন রহস্যভরা গলায় বললো, 'আজ রাতে যাবে নাকি তোমরা ভ্যাম্পায়ার দেখতে?'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?' রনি আঁতকে উঠলো—'ভ্যাম্পায়াররা আমাদের নাগালের ভেতর পেলে জ্যান্ত ফিরে আসতে দেবে?'

'তিনজন এ সঙ্গে থাকলে ওরা কিছু করতে পারবে না।'

'এসব কথা মুখেও এনো না। খেয়ে উঠেই আমি ঘরে গিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোবো।'

'ঘরে চমৎকার ভেড়ার লোমের কম্বল আছে।' নিজের হাতে ওদের খাবার টেবিলে রাখতে রাখতে বললো ফূর্তিবাজ স্তেফান—'তোমরা কি আমার ঘরে বানানো বিয়ার নেবে?'

'না ধন্যবাদ! ফুট জুস পেলেই খুশি হবো আমরা।'

'খরগোশের রোস্টের সঙ্গে টমাটো জুস মন্দ লাগবে না।' বলে রান্নাঘর থেকে তিন গ্লাস টকটকে লাল টমাটো জুস এনে টেবিলে রাখলো স্তেফান। বললো, 'এটা আমার তরফ থেকে উপহার।'

'ধন্যবাদ।' স্বপন হেসে বললো, 'আমরা কি আপনাকে এক মগ বিয়ার পান করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারি?'

'স্বচ্ছন্দে।' একগাল হেসে স্তেফান বড় চিনেমাটির মগভর্তি বিয়ার এনে ওদের টেবিলে বসলো।

খেতে খেতে শীলা স্তেফানকে বললো, 'খরগোশের রোস্ট দারুণ মজা লাগছে খেতে।'

'আজ সকালেই ফাঁদ পেতে ধরেছি।' একটু থেমে ঢক ঢক করে বেশ খানিকটা বিয়ার গিলে স্তেফান বললো, 'গত দশ দিনে তোমরাই শুধু খরগোশের রোস্ট খেতে চাইলে। রোজই বানাই, ভাবি বাইরে থেকে কোনো খদ্দের আসবে, শুধু অপেক্ষাই সার।'

স্বপন সাবধানে বললো, 'এসব ভ্যাম্পায়ার আর অতৃপ্ত আত্মার গল্প শুনলে স্বাভাবিকভাবেই টুরিস্টরা এখানে আসতে চাইবে না। বিশেষ করে যেখানে মানুষ পর্যন্ত খুন হয়।'

কাষ্ঠ হেসে স্তেফান বললো, 'গল্প কেন বলছো, ঘটনা তো মিথ্যে নয়। তবে এটা ঠিক বলেছো, তিন বছর ধরে ব্যবসায় ভারি মন্দা যাচ্ছে। আগে

এরকম সময়ে বাভারিয়া আর বোহেমিয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার জন্য সারা দেশ থেকে টুরিস্ট আসতো।'

'আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন টিটলিঙের দুর্গে ভ্যাম্পায়ার আছে?'

'অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। পাঁচটা মৃতদেহই আমি নিজ চোখে দেখেছি। নদীর ধারে পড়েছিল। গলায় দুটো দাঁতের দাগ, সারা শরীর মোমের মতো সাদা।'

'ওদের ভেতর কি এই গ্রামের কেউ আছে?'

'প্রথম দুজন গ্রামের ছেলে। ওরা মারা যাওয়ার পর গ্রামের কেউ আর দুর্গের ধারে কাছে যায় না। বাকি তিনজন বাইরের। একজন তো শুনলেই, মুনশেনের এক ওঝা। আর দুজন জিপসি।'

খাওয়ার কথা ভুলে ভয়ে কাঠ হয়ে রনি স্তেফানের কথা শুনছিল। ও কিছুতেই মেলাতে পারছিল না ওঝা কী করে ভ্যাম্পায়ারদের খপ্পরে পড়ে। বললো, 'আপনারা যাকে মুনশেনের ওঝা বলছেন ও কি সত্যি সত্যি ওঝা ছিল, নাকি মিথ্যে পরিচয় দিয়েছে?'

'মুনশেনের সেইন্ট নিকোলাসের গির্জা থেকে এসেছিল। নাম বলেছিল উলফ। কালো একটা ঝোলাব্যাগ কাঁধে নিয়ে বিকেলে গেল দুর্গে পরদিন সকালে ডানিউবের ধারে ওর লাশ পাওয়া গেল।'

'আমার মনে হয় উলফ খুবই নবিশ ওঝা।'

'কিংবা এমনও হতে পারে—দুর্গের ভ্যাম্পায়াররা এমনই শক্তিশালী যে একটা দুটো ওঝা ওদের কিছু করতে পারবে না।'

শীলা খেতে খেতে বললো, 'একটা ব্যাপার আমাকে ভাবাচ্ছে। এত বছরের পুরোনো দুর্গ, এতকাল কিছু হলো না। ছোট বেলায় আমরা অনেক বার বেড়াতে এসেছি। কখনও কিছু শুনিনি। তিন বছর ধরে হঠাৎ ভ্যাম্পায়ার এল কোত্থেকে?'

বিয়ারের মগে লম্বা চুমুক দিয়ে স্তেফান বললো, 'এ নিয়ে আমরাও আলোচনা করেছি। উলফ বলেছিল, এমন হতে পারে যে কেউ অসাবধানে দুর্গের মাটির তলায় পুরোনো কবরের কোনো অশুভ আত্মার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে। জানোই তো ভ্যাম্পায়ারদের স্বাভাবিক মৃত্যু নেই!'

'এর জন্য তো অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আপনার যেমন ব্যবসায় মন্দা যাচ্ছে!'

'ক্ষতি বলে কথা! আমারটা ছাড়া টিটলিঙে আরও দুটো সরাইখানা ছিল। টুরিস্ট তো কম আসতো না! গত বছর ও দুটো বন্ধ হয়ে গেছে। আশে পাশে

দশ গাঁয়ের লোক আসতো আমাদের বিয়ার কেনার জন্য, সেসব বন্ধ হয়েছে। জাদুঘরে সারাদিনে দশটা লোকও যায় কিনা সন্দেহ। কারিগর টমাসের পরিবার নুরেমবার্গ চলে গেল ছ' মাস আগে।'

'সবাই মিলে কিছু একটা করছেন না কেন?

'এখানকার মানুষগুলো খুবই নিরীহ। কোনো ঝামেলায় জড়াতে চায় না। আমি একবার বলেছিলাম আমাদের গির্জার ফাদারকে সঙ্গে নিয়ে সবাই মিলে ক্রস হাতে মশাল জ্বালিয়ে দুর্গে যাই। ফাদারও রাজী ছিলেন। গ্রামের লোকজন সাহস পেলো না।'

স্বপন বললো, 'গ্রামের যে দুজন মারা গেছে ওরা কারা? আপনি কি চিনতেন ওদের?'

'পিটার আর টমাস, দুই বন্ধু ছিল। তোমাদের চেয়ে বয়সে একটু বড় হবে মজা করতে গিয়েছিল দুর্গে। কিছু নিশ্চয় করেছে। নইলে এমন অপঘাতে মরবে কেন?'

'ওরা থাকে কোথায়?'

'টমাসদের বাড়ি এই রাস্তার শেষ মাথায়। ওরা বাবা ছুতোরের কাজ করে। পিটারের বাড়ি একটু দূরে। টমাসদের বাড়ির পশ্চিমে ডানিউবের তীরে। ওর বাবা নেই, মা জাদুঘরে কাজ করে।'

'মার নাম কি?'

'এঞ্জেলা গ্রিফান। জাদুঘরে টিকেট বিক্রি করে।'

ভ্যাম্পায়ারের কবলে পড়ে যাদের অপঘাতের মৃত্যু হয়েছে। তাদের সম্পর্কে স্বপনের এত কৌতূহল রনির ভালো লাগলো না। ওর খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। বললো, 'সারাদিন অনেক ধকল গেছে। আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।'

'পাঁচ মিনিট বসো। আমাদের দুই বিছানার একটা কামরায় আরেকটা বিছানা ঢোকাবার ব্যবস্থা করতে হবে।' এই বলে স্তেফান ওপরে গেল ওদের ঘর ঠিক করার জন্য।

শীলা বললো, 'এত সব খোঁজ খবর নিচ্ছো কেন স্বপন? ডালমানের স্যুটিং দেখার চেয়ে খুনীদের পেছনে ঘুরে বেড়ানো নিশ্চয় বেশি মজার হবে না।'

'খুনীদের পেছনে ঘুরবো কেন? কৌতূহল হলো তাই জানতে চাইলাম।'

'খুনী কাদের বলছো?' শীলা আর স্বপনের অজ্ঞতায় অবাক হলো রনি— 'শুনলে না ওগুলো অপঘাতের মৃত্যু? মানুষ মেরেছে নাকি যে খুন বলছো? এসব ব্যাপারে বেশি কৌতূহল দেখানো ভালো নয়।'

রনি যে এত ভীতু এটা স্বপনের জানা ছিল না। ওদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে, ওর আর শীলার বন্ধু, তাই কিছু বললো না স্বপন। তবে ও নিজে যেটা করবে বলে ভাবে সেটা না করে ছাড়ে না। সরাইখানায় দুই বুড়োর কথা শুনে ওর মনে হয়েছে। টিটলিঙের এসব মৃত্যুর জন্য কোনো অশুভ আত্মা নয়, অন্য কেউ দায়ী।

এ বিষয়ে কথা না বাড়িয়ে শীলা আর রনিকে নিয়ে ওদের রুমে গেল স্বপন। পুরোনো ধাঁচের কাঠের দোতালা সরাইখানা। বাইরে থেকে তেমন আহামরি কিছু মনে না হলেও রুমে ঢুকে স্বপনের মন ভালো হয়ে গেল। বিছানাগুলো খুবই আরামের। বসার জন্য গদি মোড়া চেয়ার, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ডরোব সবই আছে।

বিছানায় শুয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শীলা বললো, 'বাভারিয়া বেড়াতে এসে এভাবে ভ্যাম্পায়ারদের গ্রামে রাত কাটাতে হবে কখনও ভাবতে পেরেছিলে রনি?'

রনিও ওর বিছানায় শুয়ে নাক পর্যন্ত কম্বল টেনে দিয়েছে। শীলাকে বললো, 'এসব কথা রাতে একটুও ভাবতে চাই না। গুড নাইট শীলা।'

স্বপন তখন বাথরুমে ছিল। বেরিয়ে এসে দেখলো রনি আর শীলার মাথা পর্যন্ত কম্বলে ঢাকা। ওর মতো স্পোর্টসম্যানের পক্ষে পাঁচ মাইল হাঁটা কোনো সমস্যা না হলেও শীলা ধকল সইতে পারেনি। ভেবেছিল রনিকে বুঝিয়ে বলবে এসব মৃত্যু সম্পর্কে ওর ধারণার পেছনে যুক্তিগুলো কী। ওদের ঘুমোতে দেখে আলোচনাটা পরদিনের জন্য স্থগিত রেখে স্বপন জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো।

কাচের জানালার বাইরে কুয়াশামাখা সাদা জ্যোৎস্নায় ডুবে আছে বাভারিয়ার এক ছোট্ট জনপদ। ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করে আতঙ্কের সময় কাটাচ্ছে গ্রামের সরল মানুষ। মিউনিখ, ফ্রাঙ্কফুর্ট, বন কিংবা বার্লিনের মতো শহরের মানুষরা স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না জার্মানিতে এখনও এমন জায়গা আছে, যেখানকার মানুষ বিশ্বাস করে হাজার বছরের পুরোনো দুর্গ থেকে ভ্যাম্পায়াররা বেরিয়ে আসে মানুষের রক্ত শুষে খাওয়ার জন্য।

রাত এমন কিছু গভীর হয় নি। স্বপন ওর হাতঘড়িতে দেখলো সাড়ে নটা বাজে। স্তেফানের সরাইখানা বন্ধ হয়ে গেছে। গ্রামের কোথাও জীবনের কোনো সাড়া নেই। লোকজন বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে। টেলিভিশন দেখতেও ওরা ভয় পাচ্ছে, যদি এতে অশুভ আত্মার নজর পড়ে। অনেক দূরে করুণ গলায় ডেকে উঠলো একটা কুকুর। তারপর আরও একটা। কয়েক মিনিটের ভেতর অনেকগুলো কুকুর কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকতে লাগলো।

কুকুরের ডাক শুনে শীলা আর রনি বিছানায় উঠে বসলো। টেবিল লাইটের মৃদু আলোয় দেখলো স্বপন জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। রনি ভয় পাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'ওখানে দাঁড়িয়ে কী দেখছো স্বপন?'

স্বপন ঘুরে দাঁড়ালো—'একি, তোমরা ঘুমোওনি?'

'মাত্র ঘুম এসেছিল। কুকুরগুলো কিভাবে ডাকছে শুনতে পাচ্ছো না?'

'হ্যাঁ পাচ্ছি। তুমি কি ভয় পেয়েছো?'

'মানুষের চেয়ে কুকুরের বোধশক্তি বেশি। ওরা নিশ্চয় টের পেয়েছে গ্রামে যে অন্য কোনো শক্তির আবির্ভাব হয়েছে।'

'শীত পড়তে শুরু করেছে রনি। এ সময় কুকুররা কাঁদে।'

স্বপনের যুক্তি রনি গ্রহণ করতে পারলো না। শীত তো ওদের রাজধানী শহর বন—এও পড়ে। সেখানে কখনও কখনও কুকুরের এ ধরনের কান্না কেউ শোনেনি। স্বপন নিজেকে সবজান্তা মনে করে। শীলাও হয়েছে ওর মতো। রনি এ কথা কখনও অস্বীকার করতে পারবে না যে, পৃথিবীতে এখনও এমন অনেক ঘটনা ঘটে যুক্তি বা বুদ্ধি দিয়ে যার কোনো ব্যাখ্যা করা যাবে না।

হঠাৎ সবগুলো কুকুরের কান্না একসঙ্গে থেমে গেল। পূর্ণিমার চাঁদ ঢাকা পড়লো ঘন কালো মেঘের আড়ালে। রনি সভয়ে শুনলো অনেক দূরে ঘোড়ার ক্ষুরের খটখট শব্দ। স্বপনকে বললো, 'শুনতে পাচ্ছো?'

স্বপন অবাক হয়ে জানতে চাইলো,. 'কী শুনবো?'

'ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনতে পাচ্ছো না?'

স্বপন কান পেতে শুনলো রনির কথাই ঠিক মনে হলো। খুব হালকা শব্দ ধীরে ধীরে জোরালো হচ্ছে। একটু পরে পরিষ্কার বোঝা গেল। ঘোড়ায় টানা স্টেজ কোচ জাতীয় গাড়ি এদিকে আসছে। রনিকে ও বললো, 'ঘোড়ার গাড়িতে কেউ আসছে এদিকে।'

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে রনি বললো, 'মনে হচ্ছে কাউন্ট ড্রাকুলার মতো নরক থেকে উঠে এসেছে কেউ।'

গাড়ির চাকার ঘর্ঘর আর ঘোড়ার খুরের শব্দ ধীরে ধীরে জোরালো হলো। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ল্যাম্প পোস্টের আবছা আলোতে স্বপন দেখলো ঠিক সিনেমার ড্রাকুলায় যেমন দেখা গিয়েছিল, সেরকম একটা চার ঘোড়ায় টানা গাড়ি স্তেফানের সরাইখানার সামনের রাস্তা দিয়ে ছুটে গেল দুর্গের দিকে। চালকের আসনে বসে আছে কালো কোট প্যান্ট পরা একজন।

স্বপনের বিশ্বাসের দেয়ালে গভীর ফাটল দেখা দিল।

কফিনের লাশ উধাও

'তার মানে তুমি বলতে চাইছো গ্রামের লোকদের ধারণা অমূলক নয়?' চিন্তিত গলায় স্বপনকে প্রশ্ন করলেন ডার স্পিগেল পত্রিকার জাঁদরেল সাংবাদিক উলরিখ।

রাতে ডিনার সেরে হোটেল জেরানিয়ামের তিন তলায় স্বপনদের লিভিং রুমে বসেছিল সবাই। টিটলিঙ থেকে দুপুরের আগেই ফিরেছে স্বপনরা। সেদিন সকালেও নদীর ধারে এক জিপসি মেয়ের লাশ পাওয়া গেছে। আগেরগুলোর মতোই, সারা শরীর কাগজের মতো সাদা, গলার বাঁ পাশে দাঁতের কামড়ের দাগ। স্বপনের গাড়ি ঠিক করতে বেশি সময় লাগেনি। ভেবেছিল জাদুঘরে গিয়ে এর আগে নিহত পিটারের মা'র সঙ্গে কতা বলবে। সকালে ঘুম থেকে উঠে আরেকটা মৃত্যুর সংবাদ শুনে টিটলিঙে থাকা ঠিক মনে করেনি ওরা। ডেগেনডর্ফ ফিরে এসে বাবাকে সব খুলে বলেছে স্বপন। বাবা শুনে বললেন, 'এভাবে একটার পর একটা মানুষ খুন হচ্ছে, বাইরের কেউ কিছু জানে না এটা কেমন করে হয়? আমি উলরিখকে ফোন করছি। ও এখনও মিউনিখ আছে। খবরটা পত্রিকায় বেরুনো দরকার।'

বাবার টেলিফোন পেয়ে উলরিখ সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছেন। ডেগেনডর্ফ পৌঁছেছেন ডিনারের সামান্য আগে। ডিনার শেষে স্বপনের সব কথা শুনে তিনি মহা চিন্তায় পড়ে গেলেন। বললেন, 'বিংশ শতাব্দী শেষ হতে চলেছে, এখনও আমাদের বিশ্বাস করতে হবে মধ্যযুগের ভ্যাম্পায়াররা বেঁচে আছে?'

স্বপন একটু ইতস্তত করে জবাব দিল—'আমি নিজেও বিশ্বাস করতে চাই না। সকালে মিস্তিরি যখন গাড়ি সারাচ্ছিল শীলা আর রনিকে গাড়ির কাছে রেখে আমি ভাঙা দুর্গের ভেতরে গিয়েছিলাম, মাটির নিচের কামরায় কফিনের ভেতর শোয়ানো কালো পোশাক পরা মাঝ বয়সী একজনের মৃতদেহ নিজ চোখে দেখেছি। ঠোটের পাশে রক্তের দাগও ছিল। চেহারা দেখে মনে হচ্ছিলো ঘুমন্ত মানুষ, এক্ষুণি বুঝি জেগে উঠবে। গায়ে হাত দিয়ে দেখি সারা শরীর বরফের মতো ঠাণ্ডা আর শক্ত।'

'গ্রামের লোকেরা পুলিশে খবর দিচ্ছে না কেন?'

'ওরা মনে করে অশরীরী আত্মার বিরুদ্ধে পুলিশ কিছু করতে পারবে না।'

'ভালো কথা, তোমাদের এখানে যে ফিল্ম কোম্পানির লোকরা এসেছিল ওরা কি আজও ওদিকে স্যুটিং—এ গেছে?'

'কোনদিকে গেছে জানি না। তবে কালকের মতোই সকালে বেরিয়েছে। কাল ওদের টিটলিঙ যাওয়ার কথা ছিল, যায়নি।'

'জিজ্ঞেস করোনি কোথায় গিয়েছিল?'

'না, করিনি। ওরা যদি সত্যি সত্যি ক্রিমিনালদের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাহলে বেশি প্রশ্ন টশ্ন করলে সতর্ক হয়ে যেতে পারে।'

চিন্তিত মুখে কোনো কথা না বলে মাথা নেড়ে সায় জানালেন উলরিখ।

'তুমি কি টিটলিঙের এসব খুনের ঘটনা নিয়ে তোমাদের পত্রিকায় কিছু লিখবে?'

স্বপনের বাবার প্রশ্ন শুনে উলরিখ কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন। তারপর বললেন, 'দেখো শফিক, পত্রিকায় আমি যদি ভ্যাম্পায়ার আর অতৃপ্ত আত্মাদের কথা লিখি লোকে আমাকে পাগল ভাববে। এসব হত্যার পেছনে যদি সংঘবদ্ধ কোনো দল থাকে, গ্রামের লোকের সহযোগিতা ছাড়া আমি কিছুই করতে পারবো না। কারণ ছাড়া শুধু রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড বলে দায়সারা রিপোর্ট করার বয়স অনেক আগে পেরিয়ে এসেছি। আমার সমস্যাটা আশা করি কোথায় বুঝতে পেরেছো।'

স্বপন বললো, 'গ্রামের যারা মারা গেছে তাদের আত্মীয় স্বজদের যদি বুঝিয়ে বলি তাহলে হয়তো তারা কিছু তথ্য দিতে পারে, এখন যা গোপন করে যাচ্ছে। বিশেষ করে টিটলিঙ জাদুঘরের টিকেট চেকার বিধবা এঞ্জেলা গ্রিফানের একমাত্র ছেলে মারা গেছে। আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি।

'মন্দ বলো নি!' সায় জানালেন উলরিখ—'কালই চলো। সবাই মিলে টিটলিঙের জাদুঘরটা দেখে আসি! কী বলো শফিক?'

মৃদ হেসে বাবা বললেন, 'তুমি বরং ছেলেদেরে নিয়ে যাও। ইভা আর আমি দুজনই কাল ব্যস্ত থাকবো।'

বাবার কথা শুনে অভিমান হলো শীলার—'ছেলেরা মজা করে ঘুরবে আর আমি বুঝি স্কুল ছুটির দিনগুলো ঘরে বসে কাটাবো!'

তুমিও যাবে বৈকি!' বাবা হাসলেন—'ছেলেদের বলতে আমি ছোটদের বুঝিয়েছি।'

'আমরা এখন আর ছোট নেই।'

শীলার কথা শুনে বাবা গলা খুলে হাসলেন। মা বললেন, 'স্কুল ছুটির দিনগুলো মনে হচ্ছে ভালোই কাটবে তোমাদের। তোমার মত কী রনি?'

রনি খুশি হতো বাভারিয়ার ঐতিহাসিক দুর্গে ডালমানরা কিভাবে স্যুটিং করছে সেসব দেখতে পেলে। স্বপনের মা'র কথায় ও কাষ্ঠ হেসে বললো, 'তাইতো মনে হচ্ছে।'

পরদিন সকাল নটায় স্বপন ওদের বড় গাড়িটা নিয়ে টিটলিঙ এল। আসার পথে উলরিখ ওদের বার বার সাবধান করে দিয়েছেন—'কথা যা বলার আমি বলবো। তোমরা এসব খুনোখুনির ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখাবে না।'

টিটলিঙের জাদুঘরটাও পুরোনো একটা দুর্গে। তবে বেশি পুরোনো নয়। বাভারিয়ার রাজাদের বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র আর প্রাসাদে ব্যবহার করার জিনিসপত্র আছে সেখানে। জাদুঘরে গিয়ে দেখে ওরা ছাড়া আর কোনো দর্শনার্থী নেই। ভেতরে এক চক্কর ঘুরে এসে টিকেট চেকার এঞ্জেলাকে উলরিখ বললেন, 'আজকাল বুঝি লোকজন জাদুঘরের ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে?'

'তা বলতে পারেন।' পিটারের মাঝ বয়সী মা এঞ্জেলা গ্রিফান বললেন—'কী সব অভিশপ্ত আত্মার উৎপাত শুরু হলো ঈশ্বর জানেন। গত পাঁচ দিনে শুধু আপনারাই এলেন।'

পকেট থেকে নেম কার্ড বের করে এঞ্জেলাকে দিলেন উলরিখ—'আমি এসেছি টিটলিঙের ওপর একটা আর্টিকেল লেখার জন্য। খুবই আনন্দিত হবো কফি শপে বসে যদি আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারি।'

ছেলে মারা যাওয়ার পর থেকে এঞ্জেলার খুব মন খারাপ। জাদুঘরে আগের মতো লোকজন এলে, কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকলে ছেলের দুঃখ কিছু সময়ের জন্য ভুলে থাকা যেতো। জাদুঘরে এখন দর্শনার্থী একরকম আসে না বললেই চলে। একা চুপচাপ বসে থাকার মুহূর্তগুলো যন্ত্রণার মস্ত বড় বোঝা হয়ে বুকের ওপর চেপে বসতে চায়। উলরিখের আমন্ত্রণ পেয়ে খুশিই হলেন তিনি—'আপনার মতো একজন বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে পারা সৌভাগ্যের ব্যাপার।' এই বলে এঞ্জেলা তাঁর সহকর্মী টিকেট বিক্রেতা ভাগনারকে দরজার দিকে কিছুক্ষণের জন্য লক্ষ্য রাখতে অনুরোধ জানিয়ে স্বপনদের সঙ্গে জাদুঘরের পাশে ছোট্ট কফি শপে এসে বসলেন।

সবার জন্য আপেল পাই আর কফির অর্ডার দিয়ে উলরিখ বললেন, 'আপনার ছেলের মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য আমার সমবেদনা গ্রহণ করুন ফ্রুলাইন

গ্রিফান। আপনার কি সত্যি সত্যি মনে হয় পিটারের মৃত্যুর জন্য কোনো ভ্যাম্পায়ার দায়ী?'

শুকনো গলায় এঞ্জেলা বললেন, 'গ্রামের সবাই তো তাই বলছে।'

'আপনি এসব ভ্যাম্পায়ারের কুসংস্কার বিশ্বাস করেন?'

'বিশ্বাস না করে উপায় কী? কালও তো একই ভাবে জিপসি মেয়েটা মারা গেল।'

'আমাদের ধারণা এ সবের পেছনে খারাপ লোকদের কোনো দল আছে।'

'আমার ছেলে কারও কোনো ক্ষতি করেনি। ওকে কেন মারতে যাবে?'

'হয়তো ও খারাপ লোকদের কুকীর্তি সম্পর্কে জেনে ফেলেছিল। ওকে বাঁচিয়ে রাখলে ওদের বিপদ হতে পারে ভেবে ওরা মারতে পারে।'

'আপনারা আমাকে এসব কেন বলছেন?

'আপনি কি চান না পিটারের হত্যাকারীদের পুলিশ গ্রেফতার করুক, ওরা শাস্তি পাক?'

চাইলেই কি পুলিশ ভ্যাম্পায়ারদের গ্রেফতার করতে পারবে?

'আপনি সাহায্য করলে পারবে।'

'কিভাবে?'

'রাতে এ গ্রামে থাকার জন্য আমাদের গোপন একটা জায়গা দরকার।'

'গোপনে থেকে কী করবেন?'

'টিটলিঙের দুর্গে যাবো। আমার ধারণা রাতে ওখানে গেলে কোনো সূত্র পাবো।'

'না, তা হয় না।' রুক্ষ গলায় বললেন এঞ্জেলা গ্রিফান।

'কেন হয় না?'

'পিটার আর টমাসও এরকম কথাই বলেছিল। আমি বলেছিলাম এসব অশরীরী অশুভ শক্তির ব্যাপারে কোনো কৌতূহল দেখানো ভালো নয়। ওরা আমার কথা শোনেনি।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এঞ্জেলা বললেন, 'আপনারা যেখান থেকে এসেছেন সেখানে ফিরে যান। আপনাদের কারও মৃত্যুর দায় আমি নিতে পারবো না।'

'আপনি ভুল করছেন ফ্রুলাইন এঞ্জেলা গ্রিফান। অশরীরী বা অশুভ শক্তি বলে কিছু নেই। যারা পিটার আর টমাসকে হত্যা করেছে। তারা যথেষ্ট শক্তিশালী। তাই ওদের হত্যা করতে পেরেছিল। আমরা জানতে চাই পিটারদের কেন হত্যা করা হলো। হত্যাকারীরা যদি শাস্তি না পায় পিটারদের

আত্মা শান্তি পাবে না। আপনি মা হয়ে কি চান না আপনার ছেলের হত্যাকারীরা শাস্তি পাক?'

উলরিখের কথাগুলো এঞ্জেলার বুকের ভেতর জ্বালা ধরালো। কিছুক্ষণ কোনো কথা না বলে তিনি চুপচাপ বসে থাকলেন। তাঁর সামনে রাখা কফি ঠাণ্ডা হতে লাগলো। শীলা লক্ষ্য করলো তাঁর চোখ দুটো কান্নায় ভরে গেছে। ওর হাতব্যাগ থেকে এক টুকরো টিস্যু পেপার এঞ্জেলার দিকে এগিয়ে দিলো। ওটাতে চোখ মুছে নাক ঝেড়ে এঞ্জেলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ঠিক আছে হের উলরিখ। আপনি আমার বাড়িতে থাকতে পারেন।'

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।' এঞ্জেলার জন্য আরেক কাপ গরম কফির অর্ডার দিয়ে উলরিখ বললেন, 'আমাদের গাড়িটা যদি খারাপ হয়ে যায় তাহলে কি ওটা জাদুঘরের চত্ত্বরে থাকতে পারে?'

'নিশ্চয়ই পারে। তবে আমাদের এখানে ভালো মিস্ত্রি আছে। বললে সারিয়ে দেবে।'

'গাড়ি সত্যি সত্যি খারাপ হয়নি। আপনি গ্রামের লোকদের বলবেন আমরা দুপুরে আপনার বাড়িতে খেয়ে পায়ে হেঁটে ডেগেনডর্ফে ফিরে গেছি। রাতে আপনি আমাদের সরাইখানায় থাকতে বলেছিলেন। ভ্যাম্পায়ারের ভয়ে আমরা থাকতে রাজি হইনি। স্বপনরা পরশু রাতে জলজ্যান্ত ভ্যাম্পায়ার দেখেছে।'

'রাত পর্যন্ত কোথায় থাকবেন?'

'আপনার বাড়িতেই থাকবো। আপনি বলবেন লাঞ্চ করেই আমরা ফিরে গেছি। আপনার বাড়িতে নিশ্চয় ফোন আছে?'

'তা আছে।'

'ডেগেনডর্ফে ফোন করে জানিয়ে দিতে হবে রাতে আমরা ফিরবো না।'

'চলুন তাহলে।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এঞ্জেলা গ্রিফান। 'আপনাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমাকে আবার জাদুঘরে ফিরে আসতে হবে।'

সন্ধ্যে পর্যন্ত এঞ্জেলার বাড়িতে স্বপনদের কিছুই করার ছিল না। উলরিখ তাঁর ব্যাগ থেকে সমাজতন্ত্রের পতনের ওপর আমেরিকান এক গবেষকের লেখা বই নিয়ে গেস্ট রুমে সেই যে ঢুকেছেন, দুপুরে শুধু খাবার জন্য একবার বেরুলেন। এ বাড়িতে ঢুকেই স্বপনদের বলে দিয়েছেন কেউ যেন ভুলেও জানালার কাছে না যায়। এঞ্জেলা বাইরে থেকে তালা দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। স্বপনরা সময় কাটালো ভিডিও গেম খেলে। এঞ্জেলাই যাওয়ার সময় ওদের বলে গিয়েছিলেন গেম খেলতে। নাকি পিটারের খুব প্রিয় খেলা ছিল এগুলো।

জাদুঘর বন্ধ করে সন্ধ্যার আগেই ঘরে ফিরেছেন এঞ্জেলা। রান্নাঘরে ঢুকে অতিথিদের জন্য রাতের খাবার তৈরি করলেন। অবশ্য শীলাও ওঁকে রান্নাঘরে সাহায্য করলো। সাহায্য বলা ভুল হলো। শীলা রান্না করলো, তিনি শুধু তাকিয়ে দেখলেন। যখন শুনেছেন হোটেল জেরানিয়ামের হাঙ্গেরিয়ান শেফ গুস্তাভের কাছে রান্না শিখেছে শীলা, তখন ওর সামনে রান্না করতে লজ্জাই পাচ্ছিলেন এঞ্জেলা।

খাবার টেবিলে বসে রান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন উলরিখ। এঞ্জেলা বার বার বললেন, 'এতে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই। সবটুকু প্রশংসা শীলার।'

স্বপন মুখ টিপে হেসে বললো, 'আঙ্কল উলরিখ কারও নিন্দা করতে জানেন না।'

খাওয়া শেষ হতে হতে নটা বাজলো। ইচ্ছে করেই দেরি করছিলেন উলরিখ। গ্রামের সবাই দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে না পড়লে বেরুনো ঠিক হবে। না।

স্বপনরা আগের বারও দেখেছে, নটা বাজার আগেই টিটলিঙের সবাই দরজা জানালা বন্ধ করে শুয়ে পড়ে। রাস্তায় মিটমিট আলো ছাড়া কারও বাড়িতেই আলো থাকে না। উলরিখ কফি খেতে খেতে বললেন, 'আমরা সাড়ে নটায় রওনা দেবো।'

দেয়ালের ঝোলানো মাদার মেরির ছবির সামনে তিনটা মোমবাতি জ্বালিয়ে উলরিখ, শীলা আর স্বপনের নাম ধরে প্রার্থনা করলেন, যেন ওরা কোনো বিপদে না পড়ে। রনি এখানে আসার আগেই বলেছে রাতের অন্ধকারে ভ্যাম্পায়ারদের ভাঙা দুর্গ দেখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই ওর। উলরিখ ওকে বলেছেন 'তুমি তাহলে এঞ্জেলা গ্রিফানের বাড়িতেই থাকো। রাতে আমরা যদি না ফিরি সকালে, সোজা ডেগেনডর্ফ গিয়ে স্বপনের বাবাকে বলবে পুলিশ নিয়ে দুর্গে আসার জন্য।' রাতে দুর্গে যাওয়ার বদলে এ ধরণের গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব হাতে পেয়ে রনি বরং খুশিই হয়েছে। এঞ্জেলা গ্রিফান বলেছেন, 'আমি নিজেই যাবো রনিকে সঙ্গে নিয়ে।'

ঠিক সাড়ে নটায় স্বপনরা বেরুলো এঞ্জেলা গ্রিফানের বাড়ি থেকে। জন মানুষ দূরে থাক সারা গ্রামে একটা কুকুরের ডাক পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল না। ফিনফিনের কুয়াশা রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলোকে আরও ম্লান করে দিয়েছে। উত্তেজনায় স্বপন আর শীলার হার্টবিট বেড়ে গিয়েছিল। শুধু উলরিখ ছিলেন নির্বিকার। যেতে যেতে ভাবছিলেন বহুদিন পর একটা উত্তেজনাকর রিপোর্ট লিখতে হবে তাঁকে।

এঞ্জেলার বাড়ি গ্রামের উত্তর প্রান্তে। এদিকে বাড়িগুলো গা লাগানো নয়। বেশ ছাড়া ছাড়া। উত্তর দক্ষিণে টানা রাস্তা, পুব পাশে লোকজনের ঘর বাড়ি, পশ্চিমে ফাঁকা মাঠ। মাঠের শেষে ইল্‌য্‌ নদী। উলরিখ আগেই হিসেব করে রেখেছিলেন, পায়ে হেঁটে গ্রাম পেরুতে মিনিট পঁচিশেক লাগবে। তারপর বন পেরিয়ে দুর্গে পৌঁছতে বড় জোর চল্লিশ মিনিট। গ্রামের পথটুকু দ্রুত পা চালিয়ে পার হলেন।

শুক্লপক্ষের ভরা চাঁদ তখনও মাথার ওপরে ওঠেনি। বনের ভেতর পথ চেনার জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও বার বার টর্চ জ্বালাছিলেন উলরিখ। এদিককার বনগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা লাগনো। একটু বেখেয়াল হলেই সীমান্ত পেরিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়ায় চলে যেতে হবে।

রনির কথা ভেবে শীলার খারাপ লাগলো। বেচারা একা এঞ্জেলার বাড়িতে, এলেই পারতো! নিজ চোখে দেখতে পেতো ভ্যাম্পায়ার বলে যে কিছু নেই। উলরিখের যুক্তি শুনে শীলা আর স্বপন দুজনেরই বিশ্বাস—টিটলিঙের এসব হত্যাকাণ্ড কোনো ভ্যাম্পায়ারের দ্বারা হয়নি, এর জন্য দায়ী খারাপ প্রকৃতির মানুষ। স্বপনের ধারণা ডালমানরা এর সঙ্গে জড়িত। ডালমানকে দেখে রনি প্রথম দিনই বলেছিল ও নাকি নব্য নাৎসিদের মতো দেখতে। স্বভাবও ওদের মতো, রাগী আর অসহিষ্ণু, নিজে যা ভাবে মনে করে ওঠাই ঠিক। তাছাড়া প্রথম দিন ওরা বলা সত্ত্বেও ওদের বাদ দিয়ে অচেনা দুর্গে কেন স্যুটিং করতে এল, এতে করে স্বপনদের সন্দেহ আরও বেড়েছে।

জঙ্গল পেরিয়ে ওরা যখন শার্লেমানের দুর্গের ঠিক নিচে ফাঁকা জায়গাটায় এল তখনই আকাশের মেঘ সরে গিয়ে পেতলের থালার মতো চাঁদটা ওদের চারপাশে জ্যোৎস্নার ঢল নামিয়ে দিলো। ওরা পা চালিয়ে দ্রুত সরে এল বুড়ো এক গাছের তলায়।

উলরিখ চাপা গলায় বললেন, 'তোমরা তো আগেও এসেছো। চাঁদের আলো থেকে গা বাঁচিয়ে দুর্গে ঢুকতে হবে আমাদের। যেতে পারবে তো স্বপন?'

'সেক্ষেত্রে আমাদের পেছন দিন দিয়ে যেতে হবে।' স্বপন বললো, 'বেশ খানিকটা খাড়া চড়াইয়ে উঠতে হবে। আপনার অসুবিধে হবে না তো?'

'কিসের অসুবিধে!' স্বপনের কথায় মৃদু হাসলেন উলরিখ— 'মোটা মানুষ বলে অকেজো ভেবো না। দশ বছরে আগেও নিয়মিত আল্পস্—এ ক্লাইম্বিং—এ যেতাম।'

স্পাইক শু, ক্লাইম্বিং স্টিক আর সব দড়িদড়া নিয়ে পাথুরে আল্পস—এ ওঠা এক কথা আর শ্যাওলা ধরা, কোথাও ঝুরঝরে মাটি আর শুকনো ঘাসপাতায়

ঢাকা গর্ত থেকে পা বাঁচিয়ে বাভারিয়ার পাহাড়ে ওঠা ভিন্ন কথা। স্বপনের খুব একটা অসুবিধে না হলেও শীলার খুব কষ্ট হলো খাড়া পাহাড় বেয়ে তিরিশ মিটারের মতো উঁচুতে উঠতে। উলরিখও স্বীকার করলেন কাজটা যত সহজ ভেবেছিলেন মোটেই তত সহজ নয়। মোটা শরীর নিয়ে হাঁচড় পাঁচড় করে সারা গায়ে ধুলোমাটি মেখে অতি কষ্টে দুর্গের পেছনে চাতালে উঠে এসে হাঁপ ছাড়লেন।

সামনে টিটলিঙের অভিশপ্ত দুর্গের ধ্বংসাবশেষ চাঁদের আলোয় স্বপনের মনে হলো আধুনিক জগত থেকে বহু দূরে প্রাগৈতিহাসিক যুগে ফিরে গেছে ওরা। ডানা ঝটপট করে দুটো কালো বাদুর উড়ে গেল গ্রামের দিকে। হঠাৎ একটা প্যাঁচা ডেকে উঠলো। এমন যে সাহসী মেয়ে শীলা, ওর বুকের ভেতরটাও ধক করে উঠলো।

উলরিখ ফিশ ফিশ করে স্বপনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'পেছন দিক দিয়ে ঢোকার কোনো পথ জানা আছে তোমার?'

ছোট বেলায় যখন এদিকে বেড়াতে আসতো তখন বন্ধুদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে গিয়ে স্বপনরা ভাঙা দুর্গের অনেক ফাঁকফোকড়ের কথা জেনেছিল। চাপা গলায় উলরিখকে বললো, 'সামনের ওই ওক গাছটার পাশে দেয়ালে বড় ফুটো আছে। ওখান দিয়ে ঢুকে বাঁ দিকে কিছুদূর গেলেই একটা বড় ঘরে ঢোকা যাবে।'

কোনো কথা না বলে উলরিখ ইশারায় স্বপনকে পথ দেখাতে বললেন। তিনি আর শীলা নিঃশব্দে অনুসরণ করলেন ওকে। দেয়ালের বেশ বড় অংশ ধ্বসে পড়েছে। এদিকটায়। সম্ভবত জায়গাটা আগে ঘোড়ার আস্তাবল ছিল।

স্বপনের কথা মতো বাঁ দিকে খানিখটা যেতেই ছাদহীন একটা ঘর পড়লো পথে। সে ঘর পেরিয়ে ওরা ঢুকলো আস্ত একটা ঘরে। দরজা জানালায় ফোকড় দিয়ে চাঁদের আলো ঢুকে ভেতরে জমে থাকা অন্ধকার কিছুটা দূর করেছে। স্বপন ফিশ ফিশ করে বললো, 'ডান দিকের ঘরে নিচে নামার সিড়ি আছ। কফিনটা দেখতে চাইলে এখান দিয়ে যেতে হবে।'

উলরিখ মাথা নেড়ে সায় জানালেন। শীলা যাতে ভয় না পায় ওর একটা হাত তিনি শক্ত করে চেপে ধরেছিলেন। কোথাও মানুষজনের কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে কিছুটা অবাকই হয়েছেন তিনি। ওঁর ধারণা ছিল দুর্গের ভেতর ঢুকলেই বদমাশদের দলের কারও দেখা পাবেন।

স্বপনকে অনুসরণ করে পাথরের ঠাণ্ডা সিড়ি বেয়ে নিচে নামার সময় উলরিখকে বাধ্য হয়ে টর্চ জ্বালাতে হয়েছিল। এমনই জমাট অন্ধকার যে মনে হচ্ছিল গায়ে বুঝি ধাক্কা লাগবে।

নিচে নেমে স্বপন ইশারায় কফিনটা দেখালো। লোকজনের ভয় না থাকাতে উলরিখ আর টচ্ নেভাননি। কাছে গিয়ে টর্চের আলো ফেলে চমকে উঠলেন। কফিনের ঢাকনি এক পাশে সরানো। ভেতরে লাল শার্টিনের লাইনিং দেয়া। বোঝাই যায় খুব দামী কফিন। কিন্তু ভেতরে কোনো লাশ নেই। কখনও যে এতে লাশ রাখা হয়েছে তেমন কোনো চিহ্নও নেই। বলতে গেলে কফিনটা একেবারেই নতুন।

'তুমি কি সত্যি সত্যি লাশ দেখেছিলে এতে? স্বপনকে প্রশ্ন করলেন উলরিখ—'দেখার ভুল হয়নি তো?'

'আমি নিজের চোখে দেখেছি। শুধু দেখা নয়, হাত দিয়ে ছুঁয়েছি পর্যন্ত। মরে কাঠ হয়ে ছিল লাশটা।'

'তাহলে!' হতভম্ব হয়ে গেলেন উলরিখ—'লাশের কি পাখা গজিয়েছে যে উড়ে চলে যাবে?'

শুকনো গলায় স্বপন বললো, 'যদি ভ্যাম্পায়ার বলে কিছু থাকে তাহলে রাতে তার কফিনে থাকার কথা নয়। অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গেছে।'

'তার মানে ভোর হওয়ার আগে আবার তাকে ফিরে আসতে হবে?' সন্দেহ ভরা গলায় বললেন উলরিখ।

'ঠিক তাই। আমরা কি তার জন্য অপেক্ষা করবো?'

'কোনো দরকার হবে না!'

সিড়ির ওপর থেকে ভারি গমগমে গলার শব্দ শুনে ওরা চমকে উঠে সেদিকে তাকালো। ওদের চোখের ওপর ঝলসে উঠলো সার্চ লাইটের তীব্র আলো। কয়েক মুহূর্তে চোখ বন্ধ রাখতে হলো ওদের। তারপর ধীরে ধীরে চোখ মেলে দেখলো কালো আলখাল্লা পরা অস্বাভাবিক লম্বা এক লোক দাঁড়িয়ে আছে সিড়ির ওপর। ওর চেহারা দেখা যাচ্ছিল না। আবার ওর গলা শুনলো—'নেকড়ের গুহায় নেংটি ইঁদুরের উৎপাত আমি পছন্দ করি না।'

হঠাৎ কোথেকে সাদা ধোঁয়া এসে ঘর ভরে গেল। তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে যেতেই ওদের বেদম কাশি, পেলো। কাশতে কাশতে তিরিশ সেকেণ্ডের ভেতর জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো স্বপন, উলরিখ আর শীলা।

ভ্যাম্পায়ারের কবলে

কতক্ষণের জন্য ওরা জ্ঞান হারিয়েছিল এটা বোঝার কোনো উপায় ছিল না ওদের। ঘড়িতে সময় দেখতে পেলে বলা যেতো। জ্ঞান যখন ফিরলো এখন ওরা নিজেদের তিনটে চেয়ারে বসা অবস্থায় আবিষ্কার করলো। হাত দুটো চেয়ারের পেছনের টেনে বাঁধা হয়েছে। পা দুটোও চেয়ারের পায়ের সঙ্গে বাঁধা। নড়াচড়ার কোনো সুযোগই রাখা হয়নি।

চারপাশে তাকিয়ে ওরা বুঝতে পারলো না জায়গাটা কোথাকার। বড় একটা ঘরের মতো, পাথরের দেয়ালের গায়ে গ্যাস লাইট জ্বলছে। ঘরের মেঝেতে দাবার ছকের মতো সাদা কালো পাথর বসানো। উঁচু সিলিং দেখে মনে হয় কোনো পুরোনো দুর্গ, তবে এটা যে টিটলিঙের দুর্গ নয় এ বিষয়ে স্বপন নিশ্চিত। বেশি পুরোনো হলে লুডভিগের আমলের হবে, ঘরের চেহারা দেখেও মনে হয় আদৌ পরিত্যক্ত জায়গা নয়। অল্প দূরে পুরোনো আমলের লম্বা একটা টেবিল আর গোটা চারেক চেয়ার রয়েছে। দেয়াল, ঘেঁষে আরেকটা ছোট টেবিল। যে চেয়ারে ওরা বসেছিল সেগুলো যদিও পুরোনো দিনের, তবে যথেষ্ট ভারি আর শক্ত। স্যাঁতসেঁতে গন্ধ থেকে শুধু এটকু বোঝা যায় ঘরটা মাটির নিচে। যে কারণে বাইরে এখন রাত না দিন—টের পাওয়ার কোনো উপায় নেই।

স্বপন আর শীলার জ্ঞান ফিরেছিল আগে। ওদের বেশ কিছুক্ষণ পর চোখ মেলে তাকালের উলরিখ। ওরা ছাড়া ঘরে আর কেউ ছিল না। দু'দিকে দুটো মাত্র দরজা, জানালার বালাই নেই। দরজা দুটো পুরোনো ওক কাঠের, বাইরে থেকে বন্ধ। স্বপন আর শীলাকে দেখে ওঁর মনে হলো না ওরা তেমন ভয় পেয়েছে। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে পড়েছে। চেহারায় তারই ছাপ। মৃদু হেসে বললেন, 'তোমরা ঠিক আছো তো বাছারা?'

'আমাদের কিছু হয়নি। স্বপন হাসার চেষ্টা করলো।—'আপনি কেমন আছেন?'

'ভালোই আছি। পায়ে শুধু ঝিঁঝি ধরেছে। শয়তানরা আমাদের কোথায় এনেছে কিছু বুঝতে পারছো?'

'টিটলিঙের বাইরে কোথাও হবে। একশ দেড়শ বছরের পুরোনো কোনো দুর্গের মাটির নিচের ঘরে।'

'এ এলাকায় এরকম পুরোনো দুর্গ কোথায় আছে জানো?'

কাছাকাছি ফুর্সটেনেকের দুর্গ আছে। আরেকটু দূর মুনশেন দুর্গও বেশি পুরোনো নয়। কোনোটাই পরিত্যক্ত নয়। রীতিমতো বিখ্যাত টুরিস্ট স্পট।'

'তেমন জায়গায় আমাদের রাখাটা ওদের জন্য বিপদজনক হবে।'

'ওরা কারা?' জানতে চাইলো শীলা।

'মনে হচ্ছে সীমান্তের চোরাচালানীদের কোনো দল। এরাই টিটলিঙে একটার পর একটা খুন করছে?'

'কি ভাবে?'

'সেটাই তো ভাবছি।'

'ওরা কি আমাদের খেতে টেতে দেবে? আমার ক্ষিদে পেয়েছে।'

'ক্ষিদে আমারও পেয়েছে। মনে হয় জ্ঞান হারাবার পর দশ বারো ঘণ্টা কেটে গেছে।'

'তার মানে সকাল হয়ে গেছে। রনির এতক্ষণে ডেগেনডর্ফের পথে রওনা হওয়ার কথা।'

'ওরা তো আমাদের টিটলিঙের দুর্গে খুঁজবে।'

'ভালো মতো খুঁজলে নিশ্চয় সেখানে কোনো সূত্র পাবে।'

বাইরে দরজা খোলার শব্দ হলো। ওরা একে অপরের মুখের দিকে থাকালো। দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো কালো স্যুট পরা লম্বা এক লোক। খাঁটি জার্মান চেহারা, বয়স তিরিশ বত্রিশ হবে। একটা চেয়ার টেনে ওদের সামনে বসে বললো, তারপর হের উলরিখ, রাতের অন্ধকারে কী মনে করে আমাদের আস্তানায় ঢুঁ মেরেছিলেন জানতে পারি?'

'তুমি আমাকে চেনো?' লোকটার কথা শুনে অবাক হলেন উলরিখ।

বাঁ দিকের ঠোঁট বাঁকা করে সামান্য হেসে লোকটা বললো, 'জাদুঘরের টিকেট চেকারের বাড়িতে যে পুঁচকে ছোঁড়াকে রেখে এসেছিলেন পুলিশে খবর দেয়ার জন্য, ডেগেনডর্ফ যাবার পথে ওটা আমাদের হাতে ধরা পড়েছে। এবার আমার প্রশ্নের জবাব দিন।'

'কীভাবে ধরা পড়লো রনি?'

'প্রশ্ন আমি করবো, আপনি উত্তর দেবেন।'

'পরিচয় যখন জানো, কেন এসেছি সেটাও তোমার অজানা থাকার কথা নয়।'

'এটা আমার প্রশ্নের জবাব নয়।'

'তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে হঠাৎ উলরিখের বাঁ গালে প্রচণ্ড জোরে চড় মারলো লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে ওঁর ঠোঁটের কষ বেয়ে দরদর করে রক্ত গড়িয়ে পড়লো। সাপের মতো ঠাণ্ডা গলায় হিশহিশিয়ে লোকটা বললো, 'আমি না শুনতে অভ্যস্ত নই।'

দাঁতে দাঁত চেপে উলরিখ বললেন—'শুয়োরের বাচ্চা, তোর ...'

কথা শেষ না হতেই উলরিখের ডান গালে আরেকটা বড় মারলো লোকটা—'ঠিক মতো কথার জবাব না দিলে তোমার চোখের সামনে এই মেয়েটার সর্বনাশ করবো।'

স্বপন মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলো—যদি কোনোভাবে ছাড়া পায় সবার আগে এই লোকটার জিবটা সাঁড়াশি দিয়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলবো। শীলার ওপর অত্যাচার করা হবে শুনে উলরিখ ঘাবড়ে গেলেন। বললেন, 'আমি এসেছি টিটলিঙের হত্যাকাণ্ডের ওপর আমাদের পত্রিকায় রিপোর্ট লেখার জন্য।'

'ভালো!' লোকটার ঠোঁটের ফাঁকে বিদ্রুপের হাসি—'কাল ভোরে ডানিউবের ধারে চারটা রক্তশূন্য লাশ দেখবে টিটলিঙের অধিবাসীরা। আপনার রিপোর্ট দেখার সুযোগ হবে না কারও।'

'মরার আগে একটা কথা জানার খুব কৌতূহল হচ্ছে আমার।' নিরীহ গলায় লোকটাকে বললো শীলা।

'কী কথা?'

'মানুষকে তো কতভাবেই মারা যায়। এভাবে রক্তশূন্য করে মারার কারণটা কি জানতে পারি?'

'ওটা আমাদের একটা পদ্ধতি। রক্তটা কাজে লাগে। আর একই সঙ্গে মূর্খ গ্রামবাসীকে ধারণা দেয়া যায় কাজটা পার্থিব মানুষের নয়।'

'আপনারা কারা?' কেন এভাবে ভ্যাম্পায়ারদের মতো মানুষের রক্ত শুষে নিচ্ছেন?'

'আমাদের ল্যাবরেটরিতে গবেষণার কাজে মানুষের রক্ত দরকার।'

'ল্যাবরেটরিতে কী নিয়ে গবেষণা করছেন আপনারা?'

'উন্নত প্রজাতির মানুষ তৈরি সম্পর্কে।'

'আপনারা কি নব্য নাৎসি?'

'বলতে পারো। সেদিন আর বেশি দূরে নয়—জার্মানরা পুরো ইউরোপে রাজত্ব করবে।'

'হের উলরিখ একজন খাঁটি জার্মান।' স্বপন বললো, 'অত্যন্ত প্রতিভাবান জার্মান। আপনাদের নীতি অনুযায়ী তাঁকে তো হত্যা করতে পারেন না।'

'কোনো জার্মান যদি আমাদের পথের বাধা হয়, সে যত প্রতিভাবান হোক না কোন তার বাঁচার অধিকার নেই। উলরিখ একজন নোংরা কমিউনিস্ট। সে সব সময় আমাদের বিরুদ্ধে লেখে।'

'আমাকে হত্যা করা হলে তার পরিণাম কী হবে ভাবতে পারো?' বললেন উলরিখ।

'কী আর হবে! ডার স্পিগেল—এ এক কলাম আট ইঞ্চির একটা শোক সংবাদ বেরোবে।'

'শুধু তাই নয়। ইঁদুরের গর্ত থেকে প্রত্যেককে টেনে বের করে তোমাদের সব আস্তানা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া হবে।'

'আপনি অনেক বেশি আশাবাদী। আপনাদের লাশ টিটলিঙ থেকে অনেক দূরে পাওয়া যাবে। আমরা আমাদের প্রভাব বলয় বড় করতে চাই।'

'আমাদের মিউনিখ অফিস জানে আমি যে টিটলিঙ দুর্গে যাচ্ছি।'

'মিথ্যা কথা। ডেগেনডর্ফ আসার আগে পর্যন্ত তুমি জানতে না আসল ঘটনা কী!'

'এ্যাসাইনমেন্টে এসে আমি কখন কোথায় যাই সব কথা আমাদের অফিসকে জানাতে হয়। এটাই নিয়ম।'

'ভালো।' বিদ্রুপের ভঙ্গিতে শব্দটা উচ্চারণ করলেও লোকটাকে বেশ চিন্তিত মনে হলো। উলরিখ সুযোগটা কাজে লাগাতে চাইলেন—'আমরা যে পথে এসেছি, সব জায়গায় চিহ্ন রেখে এসেছি। স্কাউটিঙের ট্রেনিংটা ভালোভাবেই কাজে লাগিয়েছি।'

'চুপ কর শয়তান কমিউনিস্ট।' খেঁকিয়ে উঠলো লোকটা, তোর বিষাক্ত রক্ত নিয়ে আমাদের ল্যাবরেটরি অপবিত্র করবো না। তোকে বুনো শুয়োরের মতো জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবো।'

'সুযোগ পেলে মেরো। তার আগে তোমাদের কী দশা হয় সেটাও একবার ভেবো।'

লোকটা হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠলো—'এগুলো খুবই পুরোনো ফন্দি উলরিখ। এখানে এর কোনোটাই খাটবে না।'

'আমার আরেকটা প্রশ্ন ছিল'। বিনীত গলায় বললো শীলা।

'কী প্রশ্ন?' শীলার কথা বলা ধরনের নিজেকে বেশ কেউকেটা একজন ভাবছিল লোকটা।

'ডালমান কি আপনাদের জন্য কাজ করছে?'

'কোন ডালমান?'

'মিউনিখ থেকে এসে যে আমাদের হোটেলে উঠেছে। শার্লেমানের পুরোনো দুর্গের ওপর যে নাকি ডক্যুমেন্টারি ফিল্ম বানাবে বলে সব জায়গায় প্রচার করছে।'

'বুঝেছি। ওই মাথামোটা ইহুদিটা কেন আমাদের লোক হবে?'

'ওর ভাবসাব বেশ সন্দেহজনক। দেখে মনে হয় নব্য নাৎসি।'

'নাৎসি হওয়া খুব সহজ নয়। ইহুদিদের আরেক দফা নিকেশ করার দিন ঘনিয়ে এসেছে।' এই বলে লোকটা উলরিখের দিকে তাকালো—'সেই সঙ্গে নোংরা কমিউনিস্টদেরও।'

স্বপন নিরীহ গলায় জানতে চাইলো, 'জার্মানিতে এত জায়গা থাকতে আপনারা ঘাঁটি বানাবার জন্য আমাদের বাভারিয়া কেন বেছে নিলেন?'

'আমাদের ঘাঁটি এখানে একথা তোমাদের কে বললো? আর বাভারিয়া নিশ্চয় তোমাদের বাপের সম্পত্তি নয়।'

'আমি জানি তোমরা বাভারিয়ায় কেন আস্তানা গেড়েছো?' সবজান্তার মতো কথাটা বললেন উলরিখ।

'কেন?' লোকটার গলা বিদ্রুপে ভরা।

'পূর্ব জার্মানি থেকে পালিয়ে যারা আসছে তাদের লোভ দেখিয়ে নাৎসি বানাতে চাও। তাদের জন্য তোমরা কোনো কোনো জায়গায় অভ্যর্থনা কেন্দ্রও খুলেছো।'

'তাতে তোমার কী?'

'জার্মানির সাধারণ মানুষ এটা কখনোই মেনে নেবে না। তারা এখনও নাৎসিদের ঘৃণা করে।'

'তাতে আমাদের কিছুই যায় আসে না। যারা আমাদের ঘৃণা করে তারা দুর্বল, কাপুরুষ। তাদের দিয়ে দেশের কোনো মঙ্গল হবে না। জার্মানির দরকার সাহসী মানুষ। শার্লেমানের মতো শক্তিমান সম্রাট। হিটলারের মতো বিচক্ষণ নেতা।'

'শার্লেমান তো জার্মান ছিলেন না।' সময় কাটাবার জন্য তর্কের ভঙ্গিতে স্বপন বললো, 'তিনি তো জার্মান স্যাক্সনদের যুদ্ধে হারিয়ে জার্মান দখল করেছিলেন।'

'শার্লেমানের শরীরে খাঁটি আর্য রক্ত ছিল। স্যাক্সনরা খাঁটি আর্য ছিল না।'

লোকটার ইতিহাস জ্ঞান স্বপনকে মোটেই সন্তুষ্ট করতে পারলো না। শীলা বললো, 'আপনি কিভাবে নিশ্চিত হলেন আপনার পূর্ব পুরুষ স্যাক্সন ছিলেন না?'

'অবান্তর প্রশ্ন। আমি খাঁটি জার্মান, একজন নিষ্ঠাবান খ্রিস্টান, নাৎসিবাদে বিশ্বাস করি, এটাই আমার বড় পরিচয়।' এই বলে লোকটা উঠে দাঁড়ালো—'যাক অনেক গালগল্প হলো। মারার আগে মানুষের কোনো ইচ্ছা অপূর্ণ রাখতে নেই বলে তোমাদের কিছুটা সময় দিলাম। কমিউনিস্ট শয়তানটাকে মারতে আমাদের আনন্দই হবে। তুমি ছেলে—চেহারাটা খাঁটি জার্মান হলেও তোমার রক্তে ভেজাল রয়েছে। তার ওপর তোমাদের কৌতূহল বড় বেশি। এ বয়সে কৌতূহল থাকা ভালো। তবে বেশি কৌতূহল মানুষের মৃত্যু ডেকে আনে তোমরা তাহলে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।'

শীলা বললো, 'আমাদের আর কতক্ষণ বাঁচিয়ে রাখবেন আপনি?'

শীলার প্রশ্ন শুনে লোকটা নিজেকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মতো ক্ষমতাবান ভাবলো। এই ঘাঁটিতে ওর অবস্থান তিন নম্বরে হলেও এরা ওকে এক নম্বর ভাবছে। মেয়েটা জার্মান না হলেও ভদ্রভাবে কথা বলতে জানে। পাজি কমিউনিস্টটার পাল্লায় পড়ে নিজের মরণ ডেকে এনেছে। নইলে মেয়েটার ভদ্র আচরণের জন্য ওকে মারার আগে আরেকবার ভাবা যেতো। সামান্য হেসে লোকটা বললো, 'আরও বারো ঘন্টা আছে তোমাদের আয়ু।'

'মৃত্যুর আগে কি আমাদের কিছুই খেতে দেয়া হবে না?'

'নিশ্চয়ই দেয়া হবে। দশ মিনিটের ভেতর তোমাদের খাবার পরিবেশন করা হবে।'

'এই বারো ঘন্টা সময় আমরা আমাদের ধর্মমতে প্রার্থনা করে কাটাতে চাই।'

'করতে পারো। বাধা দিচ্ছে কে?'

'এভাবে হাত পা বাঁধা থাকলে প্রার্থনা করবো কিভাবে? প্রার্থনার আগে তা মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হতে হবে।'

একটু ভেবে লোকটা বললো, 'ঠিক আছে, হাত পা খুলে দেয়া হবে। যদি ভেবে থাকো এখান থেকে পালাবে। তাহলে বলবো তোমরা মূর্খের স্বর্গে বাস

করছো। এখান থেকে একটা পিপড়েও পালাতে পারবে না। প্রত্যেকটা দরজায় লেযার গার্ড রয়েছে। বারো সেকেণ্ডও লাগবে না পরলোকে যেতে। নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠলো লোকটার ঠোঁটের ফাকে। তারপর গট গট করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

পুরু কাঠের দরজাটা বন্ধ হওয়ার পর ঘটাং ঘটাং শব্দ হলো। বোঝাই যায় এমন দরজা ভাঙতে হলে কামান দাগতে হবে। উলরিখ কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'মিষ্টি কথা বলে শীলা অনেকখানি সুবিধা আদায় করে নিয়েছো।'

ম্লান হেসে শীলা বললো, 'শয়তানটার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে খুবই খারাপ লেগেছে আমার।'

'মন খারাপ কোরো না শীলা।' স্বপন বললো, 'শয়তানরা রনিকেও বন্দি করেছে। যেভাবেই হোক ওকে উদ্ধার করতে হবে।'

'আমরা এখান থেকে বেরুচ্ছি কিভাবে?' জানতে চাইলো শীলা।

'খাবার দিতে আসুক, হাত পা খুলুক, তারপর দেখা যাবে।'

'শয়তানরা কত বড় জাল বিছিয়েছে দেখেছো!' উলরিখ চিন্তিত গলায় বললেন, 'রনি যে ডেগেনডর্ফ যাবে সেটা পর্যন্ত জেনে গেছে!'

ভেবে আমি অবাক হচ্ছি।' স্বপন বললো, 'খবরটা ওরা জানলো কিভাবে? এঞ্জেলা গ্রিফান ছাড়া এ খবর কারও তো জানার কথা নয়!'

'তোমার কি এঞ্জেলাকে সন্দেহ হচ্ছে?' প্রশ্ন করলো শীলা।

'প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর নিজের ছেলের হত্যাকারীদের সঙ্গে তিনি হাত মেলাবেন এটা হতেই পারে না।'

'নাৎসিদের সম্পর্কে তোমাদের কোনো ধারণাই নেই।' উলরিখ বললেন, 'এঞ্জেলা যদি সত্যিই ওদের দলে যোগ দিয়ে থাকে, আর পিটার যদি বিরোধিতা করে, ওকে দলের স্বার্থে হত্যা করতে এঞ্জেলার বুক এতটুকু কাঁপবে না।'

স্বপন বললো, 'বাবার কাছে শুনেছি বাংলাদেশে নাকি নাৎসিদের মতো এরকম নৃশংস একটা দল আছে। ওখানে ওটাকে জামাত বলে।'

'শুধু বাংলাদেশে নয়।' উলরিখ বললেন, 'ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক শিবির ভেঙে যাবার পর পৃথিবীর অনেক দেশেই নাৎসিদের মতো উগ্র জাতীয়তাবাদী আর ধর্মীয় মৌলবাদীদের দল মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বিশ্বাস হারানো মানুষ খুবই ভয়ঙ্কর প্রকৃতির হতে পারে।'

আবার দরজা খোলার শব্দ হলো। দুজন স্মার্ট, নিষ্ঠুর চেহারার যুবক ঘরে ঢুকলো। দুজনের কাঁধে স্টেনগান ঝোলানো। ওদের পেছনে সাদা এ্যাপ্রন পরা ভাবলেশহীন পাথরের মূর্তির মতো একজন মহিলা ঢুকলো ট্রলি ঠেলতে

টেলতে। ট্রলির ওপর খাবার দেখে স্বপনের পেটে ক্ষিদের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো।

একজন যুবক বললো, 'মার্থা, ওদের হাত পায়ের বাঁধন খুলে দাও।'

মার্থা নামের পাথরের মূর্তিটা এ্যাপ্রনের পকেট থেকে ছুরি বের করে প্রথমে শীলার তারপর স্বপনের এবং সবার শেষে উলরিখের বাঁধন কেটে দিলো। কম বয়সী যুবকটা কর্কশ গলায় বললো, 'কোনো ঝামেলা না করে চুপচাপ খেয়ে নাও।'

শীলা নরম গলায় মহিলাকে বললো, 'ফ্রুলাইন মার্থা, আমার একটু বাথরুমে যাবার দরকার ছিল।'

মহিলা কোনো কথা না বলে কর্কশভাষী যুবকের দিকে তাকালো। যুবকের চোখের পাতায় সম্মতির ইঙ্গিত পেয়ে মার্থা পকেট থেকে চাবি বের করে উল্টো দিকের দরজার তালা খুলে দিলো। ওটা যে বাথরুম শীলারা বুঝতে পারেনি। ভেবেছিল ওটা অন্য ঘরে যাবার দরজা।

'যেতে পারি?' মার্থার সম্মতি চাইলো শীলা।

মহিলা মাথা নেড়ে ইশারা করলো। তারপর তিন নাৎসি ঘর থেকে বেরিয়ে কাঠের দরজা বন্ধ করে দিলো।

হাত পা ঝাড়তে ঝাড়তে উলরিখ বললেন, 'এবার কী করা যায় বলতো!'

'আগে তো খাবারগুলো যথাস্থানে পাঠাই! খেতে খেতে ভাববো।'

খাবারের পাত্রগুলো ঢাকা ছিল। শীলা এসে ঢাকনি তুলতেই সবার মন ভরে গেল। প্রচুর খাবার পাঠিয়েছে। বড় বাটিতে ঘন রাইস সুপ, আলাদা জায়গায় মাংশের স্টেক, সালাদ আর রুটি। সুপে দেয়ার জন্য কেভিয়ার সস, গোল মরিচের গুঁড়ো, লবণ সবই আছে। এমনকি ন্যাপকিনটাও বাদ দেয়নি। পান করার জন্য তিন ক্যান অরেঞ্জ জুসও দিয়েছে।

'দারুণ জিনিস!' বলে উলরিখ স্যুপের বাটির দিকে হাত বাড়াতেই স্বপন বাধা দিলো—'ওটা ছোঁবেন না।'

ঘাবড়ে গিয়ে উলরিখ হাত সরিয়ে নিয়ে সন্দেহভরা গলায় বললেন, 'তোমার কি মনে হয় ওতে বিষ মেশানো আছে?'

'না বিষ নয়।' স্বপন হেসে বললো, 'এটা দিয়ে ওদের ঘায়েল করবো। আমার মনে হয় বিফ স্টেক আর সালাদই আমাদের জন্য যথেষ্ট।'

নিজের প্লেটে সালাদ তুলতে তুলতে উলরিখ জানতে চাইলেন, 'স্যুপ দিয়ে কিভাবে ওদের ঘায়েল করবে?'

রহস্যভরা গলায় স্বপন বললো, 'ওরা কী রকম স্মার্টলি চলাফেরা করে লক্ষ্য করেছেন? নাক উঁচু করে গট গট করে হাঁটে, মাটির দিকে তাকাতে ঘেন্না করে।'

'দাম্ভিকতা আর কর্তৃত্বপরায়নতা বোঝাবার জন্য ওরকম করে। তার সঙ্গে রাইস স্যুপের কী সম্পর্ক?'

'দরজা খোলার শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে স্যুপ ঢেলে ঘরের মেঝে ভিজিয়ে দেবো। স্যুপের সঙ্গে ক্যাভিয়ার সসও মেশানো থাকবে। ওতে পা পড়া মাত্র সব কটা পিছলে পড়ে ধড়াম করে আছাড় খাবে। শীলা তৈরি থাকবে গোলমরিচের গুঁড়ো নিয়ে। আছাড় খাওয়া মাত্র ওদের চোখে গোলমরিচের গুঁড়ো ছিটিয়ে দেবে। তারপর আমরা ওদের এসএমজিগুলো হাতিয়ে বেরিয়ে পড়বো।'

রুটি দিয়ে ষ্টেক খেতে খেতে উলরিখ বললেন, 'তোমার প্ল্যান খুবই ভালো। কিন্তু ওরা যদি একসঙ্গে ঘরে না ঢুকে এক এক করে ঢোকে? একজন আছাড়া খেলে অন্যরা নিশ্চয়ই সতর্ক হয়ে যাবে!'

'আমি আর আপনি দরজার দুপাশে তৈরি থাকবো। সঙ্গীকে আছাড় খেতে দেখলে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য হলেও বাকিরা হতভম্ব হবে, ওদের সতর্কতা ঢিলে হয়ে যাবে। ওরই ভেতর ওদের ঘায়েল করতে হবে।'

'কালো স্যুট যে বললো দরজায় দরজায় নাকি লেযার গার্ড আছে!' শীলা জানতে চাইলো, 'লেযার রে থেকে বাঁচবে কিভাবে?'

'আঙ্কল উলরিখ যেমন ওকে ভয় দেখাবার জন্য বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা বলেছেন, ওই লোকটাও লেযারের কথা বলেছে। দরজায় যদি লেযার থাকতো তাহলে এ ঘরে গ্যাসের বাতি জ্বলতো না, ইলেকট্রিক লাইট থাকতো।'

'ঠিক বলেছো।' খেতে খেতে সায় জানালেন উলরিখ—'লোকটা সম্ভবত ক্রাইম ছবির ভক্ত। নিশ্চয় এরকম পাহারার কথা কোনো ছবিতে দেখেছে। এবার খাওয়ার দিকে নজর দাও।'

পালাবার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে ওরা গভীর পরিতৃপ্তির সঙ্গে নাৎসিদের খাবার সদ্ব্যবহার করলো।

জয় পরাজয়ের পালা

সব কিছু যে স্বপনের প্ল্যান মতো ঘটবে এ নিয়ে ওদের তিনজনেরই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। প্রথমতঃ ওরা যদি ঘরে না ঢুকে দরজায় দাঁড়িয়ে শুধু মার্থাকে ভেতরে পাঠায় সেক্ষেত্রে মার্থা আছাড় খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদে ঝোলানো এসএমজি দুটো ওদের হাতে এসে যাবে। ঘটনাটা কী ঘটেছে বুঝতে দেরি হবে না। দ্বিতীয়তঃ ওদের জুতোর তলায় ক্রেপ থাকতে পারে। থাকাটাই স্বাভাবিক, যেহেতু পাহাড়ি পাথুরে পথে চলাফেরা করে—সেক্ষেত্রে কেউই আছাড় খাবে না। ভেতরে ঢুকে দেখবে দরজার দুপাশে স্বপন আর উলরিখ চেয়ারের দুটো খুটো হাতে দাঁড়িয়ে আছে—তখন কী হবে?

স্বপনদের পরম সৌভাগ্য বলতে হবে—ওদের জুতোর তলায় ক্রেপ ছিল না, থকথকে ক্যাবিয়ার মেশানো ঘন রাইস স্যুপও ঘরের পাথরের মেঝেকে অসম্ভব পিচ্ছিল করে রেখেছিল এবং আগের মতোই দরজা খুলে প্রথমে দুই পাহারাদার গটগট করে ঢুকেছিল।

দড়াম করে আছাড় খেয়ে একজন স্লিপ করে চলে গেল শীলার পায়ের কাছে, যার বিস্ফোরিত চোখে গোল মরিচের গুঁড়ো ছিটিয়ে মাথায় ভারী চামচ দিয়ে এক ঘা বসাতে ওর মোটেই বেগ পেতে হলো না। আরেকজন আছাড়া খেয়ে সাঁ করে টেবিলের দিকে যেতেই খটাস করে টেবিলের ভারি পায়ার সঙ্গে মাথা ঠুকে গেল। মুহূর্তের ভেতর সেও জ্ঞান হারালো। মার্থা দরজায় দাঁড়ানো ছিল। এমন অভাবনীয় ঘটনা দেখে যেই চিৎকার দিতে যাবে ঘাড়ের ওপর উলরিখের হাতে ধরা চেয়ারের খুটোর বাড়ি খেয়ে ভেজা কাপড়ের মতো ঝুপ করে পড়ে গেল মেঝের ওপর।

সাব মেশিনগান দুটো পাহারাদারদের কাঁধের ওপর থেকে খসিয়ে নিয়ে উলরিখ আর স্বপন নিজেদের হাতে নিলো। অস্ত্র হিসেবে ভারী স্টেনলেস স্টিলের চামচ যে যথেষ্ট কার্যকরী এর প্রমাণ শীলা হাতেনাতেই পেয়েছে। হাতের মুঠোয় ওটা শক্ত করে ধরে স্বপন আর উলরিখের পেছন পেছন ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

দরজার বাইরে লোহার আঙটায় ঝোলানো বড় একটা টিপতালা হা করা অবস্থায় ঝুলছিল। স্বপন দরজা বন্ধ করে তালা টিপে দিলো।

বাইরের জায়গাটা সরু করিডোরের মতো। একদিকে খাড়া মসৃণ দেয়াল অন্যদিকে সারি সারি কামরা। বেশির ভাগই বাইরে থেকে তালা বন্ধ। দেয়ালে বেশ দূরে দূরে গ্যাস লাইটের আলো থাকলেও তাতে অন্ধকার খুব সামান্যই দূর হয়েছে। ওরা হাঁটছিল পা টিপে টিপে। তালা ছাড়া এমনি দরজা লাগানো ঘরগুলোতে লোকজন থাকতে পারে।

গোটা দশেক দরজা পেরুনোর পর ওরা দেখলো করিডোরটা ইংরেজি 'এল' অক্ষরের মতো বেঁকে গেছে। ওপাশে মানুষের গলার শব্দ শুনেই ওরা থমকে দাঁড়ালো। কারা যেন ওপাশ থেকে কথা বলতে বলতে এদিকে আসছে।

বাঁ পাশের তালা ছাড়া দরজার দিকে সরে গেল ওরা। সামান্য ধাক্কা দিতেই খুলে গেল দরজাটা। কোনো কিছু না ভেবে হুট করে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো। এর দশ সেকেণ্ড পরই ওরা শুনলো তিন জন লোক পাথরের মেঝের ওপর দিয়ে খট খট জুতোর শব্দ তুলে হেঁটে গেল।

ওদের ভয় ছিল লোকগুলোর গন্তব্য যদি এ ঘরটা হয় তাহলে ওরা কী করবে? এসএমজিতে অবশ্য ম্যাগজিন ভরা ছিল। উলরিখ স্বপনকে দেখিয়ে দিয়েছেন হোক এটা ওরা কেউ চাইছিল না। লোকগুলো ওদের দরজা পেরিয়ে চলে যাবার পর স্বপনরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে যাবে, তখনই টের পেলো ঘরের ভেতরটা ভয়ঙ্কর রকম ঠাণ্ডা আর উৎকট এক গন্ধ সেখানে জমাট বেঁধে আছে। অন্য ঘরের মতো এ ঘরের দেয়ালেও গ্যাস লাইট জ্বালানো। সাদা কুয়াশা ছড়ানো ছিল ঘরে। তার ভেতর দিয়ে আবছা যে দৃশ্য ওরা দেখলো তাতে ওদের বুক কেঁপে উঠলো।

ঘরটা ছিল নাৎসিদের ল্যাবরেটরি। টেবিলে বুনসেন বার্নার জ্বলছে। বার্নারের ওপর বড় বিকারে লাল রঙের পদার্থ ফুটছে। নানা ধরনের ছোট পাত্র ইতস্তত ছড়িয়ে আছে টেবিলে। পাশের টেবিলে একটা চিমসানো লাশ শোয়ানো রয়েছে, অনেকটা মিশরের মমির মতো। বুকের কাছটা খোলা, ভেতরে হৃৎপিণ্ড, যকৃত, ফুসফুস সব দেখা যাচ্ছে। বোঝা যায় কাজ করতে করতে কেউ এইমাত্র কোথাও গেছে, এক্ষুণি এসে পড়বে। ঘরের ভেতর তাপ হিমাঙ্কের কাছাকাছি, আর কিছুক্ষণ থাকলে স্বপনদের হাত পা জমে বরফ হয়ে যাবে। কারণ ওদের গায়ে খুব হালকা গরম কাপড় ছিল। বাভারিয়ায় অক্টোবরে আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে কেউ গরম কাপড় পরে না।

শীলা নাক কুঁচকে চাপা গলায় বললো, 'আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

উলরিখ ওর হাত ধরলেন—'চলো, বেরিয়ে পড়ি। এখনই কেউ এসে পড়বে এ ঘরে।' এই বলে তিনি শীলাকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

একটু পরেই স্বপন এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিলো শীলাকে বললো, তাড়াতাড়ি হাঁটো, কখন কী ঘটে বলা যায় না।'

পর পর তিনটা বাঁক পেরিয়ে ওরা বড় একটা হলঘরে এসে ঢুকলো। জায়গাটাকে মনে হলো মাকড়শার শরীরের মতো। দু'পাশ থেকে গোটা ছয়েক টানেল চলে গেছে অজানা গন্তব্যে, ওদেরটা তার ভেতর একটা। মাকড়শার মাথার কাছে ওপরে ওঠার লোহার ঘোরানো সিড়ি। সিড়ির দিকে নজর পড়া মাত্র ওরা তিনজন ছুটে গেল সেদিকে।

সিড়ি বেয়ে তেইশ ধাপ ওঠার পর আবার একটা টানেল। এটার দু'দিকে নিরেট পাথরের দেয়াল। পাশাপাশি দু'জনের বেশি হাঁটা যায় না। এসএমজি হাতে স্বপন আগে আগে হাঁটছিল। ঠিক হাঁটা নয়, বলতে গেলে একরকম দৌড়াচ্ছিল। পেছনে শীলার অসুবিধে না হলেও ঝানু পবর্তারোহী উলরিখ কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। টানেলের শেষ মাথায় এসে থমকে দাঁড়ালো স্বপন। উলরিখ আর শীলাকেও দাঁড়াতে হলো। সামনে এগুবার কোনো পথ নেই। মনে হয় টানেলটা তৈরি করতে করতে হঠাৎ কাজ থামিয়ে মিস্ত্রিরা চলে গেছে। অস্ফুট গলায় শীলা বললো, 'এখন কী হবে!'

স্বপন চিন্তিত গলায় বললো, 'আমার মনে হয় যে সিড়ি বেয়ে ওপরে উঠেছি। ওটা আমাদের মতো কাউকে বিভ্রান্ত করার জন্য বানিয়েছে। আমি তখনই ভাবছিলাম সিড়ির নিচে বা ওপরে কোনো পাহারাদার নেই কেন?'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছো আমাদের আবার নিচের হলঘরে যেতে হবে?' শীলার গলায় হতাশার ছোঁয়া।

উলরিখ বললেন, 'দাঁড়াও। রাজা লুডভিগের একটা দুর্গে এরকম একটা সুড়ঙ্গ দেখেছিলাম। এসো তো, সবাই মিলে সামনের দেয়ালটাকে ধাক্কা দিয়ে দেখি, কিছু হয় কি না!'

মনে সন্দেহ নিয়ে স্বপন আর শীলা সামনের পাথরের দেয়ালে ধাক্কা দিলো। উলরিখও জোরে ধাক্কা দিলেন যেমন দেয়াল তেমনই রইলো।

'মাঝখানে নয়', উলরিখ বললেন, 'কিনারের দিকে ধাক্কা মারতে হবে।'

প্রথমে বাঁ দিকের কোনে ধাক্কালো সবাই। কিছুই হলো না। ডান দিকেও জানা কথা কিছু হবে না—এমন একটা মনোভাব নিয়ে ধাক্কা মারতেই মনে হলো দেয়ালটা সামান্য নড়ে উঠেছে। চাপা উত্তেজিত গলায় উলরিখ বললেন, 'এতক্ষণে পেয়েছি। গায়ের সবটুকু শক্তি দিয়ে ধাক্কা মারো।'

দেয়াল নড়তে দেখে স্বপন আর শীলার গায়ের জোর ডবল হয়ে গেল। পাথরের দেয়ালে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারলো ওরা। মেঘ ডাকার মতো গুরু গম্ভীর শব্দ করে পাথরটা ফুট দেড়েকের মতো সরে আবার অনড় হয়ে গেল।

ফাঁক দিয়ে স্বপন আর শীলা অনায়াসে বেরিয়ে এল। বেগ পেতে হলো উলরিখের বেলায়। মোটা শরীর নিয়ে গা হাতের চামড়া ছিঁড়ে ফুঁড়ে একাকার হয়ে গেল তাঁর। তবে শেষ পর্যন্ত ঠিকই বেরিয়ে এলেন তিনি। মনেমনে ঠিক করলেন যদি এই সুড়ঙ্গের গোলক ধাঁধা থেকে প্রাণ নিয়ে বেরুতে পারেন, শরীরের ওজন একশ পাউন্ড কমিয়ে ফেলবেন।

পাথরের দরজার এপাশে এসে স্বপন চারদিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো। আপন মনে বললো, 'জায়গাটা কেমন যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে।'

চিনতে ওর বেশি দেরি হলো না। এখানেই কফিনে শোয়ানো লাশ দেখেছিল স্বপন। অবাক হয়ে বললো, 'আরে এটা তো টিটলিঙের দুর্গ! সেদিন এ ঘরেই কফিনের ভেতর তাজা লাশ দেখেছিলাম। কাল রাতেও তো কফিনটা এখানে ছিল!'

হাত তুলে আঙুল দিয়ে ইশারা করে ও জায়গাটা দেখালো উলরিখ আর শীলাকে। হঠাৎ করে অচেনা গোলক ধাঁধা থেকে বেরোবার পথ পেয়ে ওদের টান টান সতর্কতায় ঢিল পড়েছিল। আর তখনই বন্দুকের গুলির শব্দ হলো। পেছন থেকে পর পর দুটো গুলি ওদের হাত থেকে এসএমজি দুটোকে ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিলো দেয়ালের দিকে। পেছনে তাকাতেই ওদের চোখে পড়লো কালো স্যুট পরা নাৎসিটাকে। ওর সঙ্গে একজন এলএমজিধারী প্রহরীও রয়েছে। ওদের দিকে পিস্তল তাক করে লোকটা নিষ্ঠর হেসে বললো, 'ল্যাবরেটরি থেকে বেরুতেই আমার নজরে পড়ে গিয়েছিলে। হাতে ও দুটো থাকাতে এতক্ষণ কিছু বলিনি। এবার সবাই মাথার ওপর হাত তোলো।'

কোনোরকম প্রতিবাদ না করে স্বপনরা হাত তুললো। লোকটা রুক্ষ গলায় বললো, 'পেছনে না তাকিয়ে সোজা তোমাদের ডান দিকের ঘরে ঢুকে যাও।'

স্বপনরা ডান দিকে ঘোরা মাত্র বাইরে বু—ম করে বিকট শব্দ হলো। মনে হলো কেউ বুঝি পাঁচশ পাউণ্ডের বোমা ফাটিয়েছে। ওরা থমকে দাঁড়ালো। বাঁ পাশের দেয়াল ঘেঁষা সরু পাথরের সিড়ি বেয়ে দৌড়ে থামলো এক স্টেনধারী। হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'পুলিশ পুরো এলাকা ঘিরে আমাদের আত্মসমর্পণ করতে বলছে। আমি করিনি। ওরা বলছে বোমা মেরে নাকি দুর্গ উড়িয়ে দেবে।'

'এতই সোজা বুঝি দুর্গ ওড়ানো?' স্বপনদের দিকে তাকিয়ে কালো স্যুট পরা নাৎসিটার ঠোঁটের ফাঁকে কুৎসিত হাসি ফুটে উঠলো—'চার চারটা জিম্মি আমাদের হাতে আছে। এদের এভাবে রেখে আমরা যদি স্বর্গে চলে যাই সেটা খুবই অমানবিক আর স্বার্থপরতা হবে।' একটু থেমে ওর সঙ্গের লোকটাকে

বললো, 'এলার্ম বেল বাজিয়ে দাও। এদের বারো নম্বরে আটকে রেখে পাহারা দাও। আমি ওপরে যাচ্ছি।'

এলএমজি হাতে লোকটা ইশারায় স্বপনদের এগুতে বললো। উলরিখের মুখে চাপা উল্লাস। শীলা বাংলায় স্বপনকে বললো, 'রনিকে নিশ্চয় দুর্গের ভেতর কোথাও লুকিয়ে রেখেছে।'

'কোনো কথা নয়' পেছন থেকে বাজখাই গলায় বললো এলএমজি।

বারো নম্বর ঘরটা আরও একতলা নিচে। ওরা নামছিল পাথরের সিড়ি বেয়ে। সবার আগে উলরিখ আর শীলা তারপর স্বপন, ওর পেছনে এলএমজি। কালো স্যুট এ্যালার্ম বাজাবার কথা বলেছিল। স্বাপনরা এ্যালার্মের কোনো শব্দ শুনতে পেল না। স্বপন নির্বিকার গলায় বললো, 'শীলা তোমরা তাড়াতাড়ি নামো।'

পিঠে এলএমজির নলের স্পর্শ পেলো স্বপন—'মানা করেছি না সাংকেতিক ভাষায় কথা বলবে না।'

এ্যালার্ম না বাজাতে স্বপনদের মতো এলএমজিও কিছুটা চিন্তিত ছিল। তখনও সিড়ির আট নয় ধাপ নামতে বাকি। আগেকার দিনের বানানো, ধাপগুলো এক ফুটেরও বেশি উঁচু, তবে যথেষ্ট প্রশস্ত নয়। সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছিল স্বপনদের।

শীলা আর উলরিখ সিড়ির নিচে নেমে যেতেই টপ করে বসে পড়লো স্বপন। স্কুলে এমন বাঁদরামো ওরা অনেখ করেছে। পেছন পেছন আসা এলএমজি হাতে লোকটা স্বপনের গায়ে টক্কর খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো কালো গ্রানাইট পাথরের সিড়িতে। নাক ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে গোটা চারেক দাঁতও ভাঙলো ওর। পেছন থেকে স্বপনের কড়া লাথি খেয়ে গড়িয়ে পড়লো সিড়ির শেষ ধাপে। বলা বাহুল্য ততক্ষণে পুরোপুরি জ্ঞান হারিয়েছে লোকটা।

উলরিখ এলএমজিটা হাতে তুলে নিয়ে বললেন, 'শিগগির ওপরে চলো, পোড়া গন্ধ পাচ্ছি। কোথাও আগুন ধরেছে।'

শীলা বললো, 'রনিকে সঙ্গে না নিয়ে আমি ওপরে যাবো না।'

'রনি এখানে এ কথা কে বললো তোমাকে?' উলরিখ বললেন, 'নাৎসিটা তখন কী বলেছিল ভুলে গেছো নাকি! ওকে ওরা অন্য জায়গায় রেখেছে।'

উলরিখের সঙ্গে সিড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে শীলা জানতে চাইলো, 'এখানে না রেখে অন্য জায়গায় কেন রাখবে?'

'জেরা করতে সুবিধে হবে বলে। জলদি চলো।'

স্বপন মৃদু হেসে বললো, 'ল্যাবরেটরি থেকে বেরোবার সময় আমিই বার্নারটা কাত করে রেখে এসেছিলাম।'

'সর্বনাশ!' উলরিখ খুশিতে গদগদ হলেন—'ল্যাবরেটরিতে যে নানারকম এক্সপ্লোসিভ জিনিসপত্র থাকে।'

স্বপন নির্বিকার গলায় বললো, 'ভ্যাম্পায়ারদের আগুনে পুড়িয়ে মারাই তো নিয়ম।'

'ভ্যাম্পায়ার কোথায় দেখলে?' শীলা অবাক হলো—'তুমি কি রনির মতো এসব বিশ্বাস করা আরম্ভ করলে নাকি?'

'নাৎসি আর ভ্যাম্পায়ার একই জিনিস শীলা।' উলরিখ যেতে যেতে বললেন, 'নাৎসিদের মতো অশুভ শক্তি পৃথিবীতে আর কী আছে?'

ওরা যখন দুর্গের ওপরের ঘরে এল তখন একই সঙ্গে দুটো বিস্ফোরণের শব্দ হলো। একটা মাটির নিচে, আরেকটা দুর্গের বাইরে। দৌড়ে দুর্গের বাইরে এসে দেখলো শেষ বিকেলের আকাশে হেলিকপ্টার চক্কর দিচ্ছে। নাৎসিরা আত্মসমর্পণ করেছে। একদল পুলিশ এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। উলরিখ অবাক হয়ে বললেন, 'পুলিশ খবর পেলো কোত্থেকে?'

এমন সময় 'শীলা! স্বপন!' বলে চিৎকার করে পুলিশদের পেছন থেকে রনি ছুটে এল দুর্গের চত্বরে।

'আরে রনি!' অবাক হয়ে শীলা বললো, 'তোমাকে না ওরা বন্দি করেছিল! ছাড়া পেলে কি ভাবে?'

রনি হেসে বললো, 'আমাকে বন্দি করলে কি হবে, ফ্রুলাইন এঞ্জেলাকে তো বন্দি করতে পারেনি। তিনিই ডেগেনডর্ফ গিয়ে খবর দিয়েছিলেন।'

'তোমাকে বন্দি করলো কিভাবে?'

'এর জন্য স্বপনের বিএমডব্লু দায়ী। সকালে আমরা ঠিকই রওনা দিয়েছিলাম। গ্রামের সীমানা পেরিয়ে যেই জঙ্গলের রাস্তায় ঢুকলাম অমনি গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ। কি করবো ভাবছি তখনই দেখি পেছনে এসে দাঁড়ালো ছুতোর মিস্ত্রি কার্লোফের গাড়ি এঞ্জেলা আমাকে ডেগেনডর্ফ পৌঁছে দিতে যাচ্ছেন শুনে বললো ও নাকি ওদিকেই যাচ্ছে। ফ্রুলাইনকে কষ্ট করতে হবে না। আমাকেও দিব্যি লিফট দিতে পারবে। ওর গাড়িতেই এঞ্জেলাকে জাদুঘরে নামিয়ে দিয়ে আমাকে নিয়ে বেরুলো। পেছনের সিটে ছিল আরেকটা লোক। কিছুক্ষণ পর পেছনের লোকটা আমার নাকে ক্লোরোর্ফমে ভেজানো রুমাল চেপে ধরলো। জ্ঞান ফিরলো কার্লোফের বাড়িতে। আরও লোক ছিল সেখানে। প্রথমে কিছু বলতে চাইনি। যখন বললো, সাঁড়াশি দিয়ে চোখ উপড়ে নেবে তখন সব বলে দিলাম।'

ততক্ষণে একজন অফিসার সহ পুলিশের দল দুর্গের চত্বরে পৌঁছে গেছে। তরুণ অফিসার হেসে উলরিখের সঙ্গে হাত মেলাতে মেলাতে বললো, 'সবাই এঞ্জেলার বাড়িতে অপেক্ষা করছে। চলুন আমরা সেখানে যাই।'

উলরিখ উত্তেজিত গলায় বললেন, 'দুর্গের নিচে অনেক ঘর। ওদের লোকজনরা সব শেয়ালের মতো সুড়ঙ্গ কেটে সাংঘাতিক এক আস্তানা বানিয়েছে।'

'সুড়ঙ্গের একটা মুখ ছুতোর মিস্ত্রি কার্লোফের বাড়িতে। আপনি ভাববেন না। ওদের ব্যবস্থা আমি করছি।'

শুধু এঞ্জেলা গ্রিফান নয়, তাঁর বাড়িতে স্বপনের বাবা মাও অপেক্ষা করছিলেন উৎকণ্ঠিত হয়ে। স্বপনদের দেখে তাঁদের মুখে হাসি ফুটলো। এঞ্জেলা ছুটে এসে শীলাকে জড়িয়ে ধরলেন—'লক্ষী মেয়ে, শয়তানরা কি তোমাদের মারধোর করেছিল?'

মৃদু হেসে শীলা বললো, 'না ফ্রুলাইন। তবে আপনি যদি পুলিশে খবর না দিতেন তাহলে কাল সকালে ডানিউবের তীরে আমাদের লাশ পাওয়া যেতো।'

স্বপন ব্যগ্র গলায় এঞ্জেলাকে প্রশ্ন করলো, 'আপনি তো জানতেন না রনিকে ওরা গ্রেফতার করেছে। পুলিশে খবর দেয়ার কথা আপনার মনে হলো কেন?'

একগাল হেসে এঞ্জেলা বললেন, 'আমারও কি মনে হতো? ভাগ্যিস জাদুঘরে এসে কথাটা ভাগনারকে বলেছিলাম। ও শুনেই আঁতকে উঠলো—নাকি কার্লোফ ইদানীং বদলোকের পাল্লায় পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। বললো, বিদেশী একটা ছেলের জন্য কার্লোফের এমন গায়ে পড়া দরদ খুবই সন্দেহজনক। ও নাকি বিদেশীদের দু' চোখে দেখতে পারে না। শুনেই আমি গাড়ির মেকানিখ গুস্তাভকে নিয়ে ছুটলাম তোমাদের গাড়ি সারাতে। আমার ছোট গাড়ি নিয়ে এতদূর যেতে সাহস হচ্ছিলো না। গুস্তাভ বললো, আমার একা যাওয়া ঠিক হবে না। সেও সঙ্গে যাবে। তারপর আমরা ডেগেনডফ এসে পুলিশকে সব বললাম। পুলিশও নাকি সন্দেহ করছিল বদমাশরা এখানে আখড়া বানিয়েছে। কোনো সূত্র পাচ্ছিল না বলে এগুতে পারছিল না। পুলিশ স্টেশন থেকে জেরানিয়াম গিয়ে তোমাদের বাবা মাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরলাম দুপুরে। সেই থেকে অপেক্ষা করছি তোমাদের জন্য।

উলরিখ একগাল হেসে বললেন, 'আমার কী বুদ্ধি! ফ্রুলাইনকে আমি নাৎসিদের দলের বলে সন্দেহ করে বসেছিলাম!'

স্বপন বললো, 'আমরা যেমন ডালমানকে করেছিলাম।'

ছোটদের স্ট্রবেরি জুস আর বড়দের হাতে বিয়ারের মগ ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আজ কারও ফেরা হবে না। তোমরা টিটলিঙের অভিশাপ ঘোচানোর জন্য এত বড় ঝুঁকি নিয়েছো শুনে গ্রামের সবাই তোমাদের জন্য গির্জায় প্রার্থনা করছে।'

সন্ধ্যার পর তরুণ পুলিশ অফিসার এল এঞ্জেলার বাড়িতে। বললো, 'সব মিলিয়ে মোট এগারো জন ধরা পড়েছে। তবে আসল শয়তান বরিসই নাকি পালিয়ে গেছে।'

'বরিস কোনটা?' জানতে চাইলে উলরিখ। সব কিছু ওঁর জানা দরকার। ডার স্পিগেল পত্রিকায় রিপোর্ট লেখার জন্য দারুণ সব মাল মশলা জোগাড় হয়েছে।

'লম্বা কালো স্যুট পরা, আমাদেরই বয়সী। ধরা পড়তো ঠিকই, হঠাৎ স্মোক বম্ব ছুঁড়ে আমাদের কাবু করে পালিয়ে গেল। ধরতে পারলে ওর কাছ থেকে কথা বের করা যেতো।'

এঞ্জেলা বললেন, 'যে মার খেয়েছে, শয়তানটা নিশ্চয় টিটলিঙের ধারে কাছে আসবে না।'

'আমার সরাইখানা আবার আগের মতো জমজমটা হয়ে উঠবে।' হাসি মুখে ঘরে ঢুকলো বুড়ো স্তেফান—'শোনো ছেলেমেয়েরা, তোমাদের বাবা মাকেও বলি। আজ গ্রামের সবার জন্য আমার পানশালা খোলা। তোমরা আমার বিশেষ অতিথি। আশা করি শীলার সঙ্গে আমার নাচ সবাই উপভোগ করবে।'

ফুর্তিবাজ বুড়ো স্তেফানের কথায় ঘর সুদ্ধো সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলো। গ্রামের আরও লোক জড়ো হলো এঞ্জেলার বাড়িতে। তাদের ভেতর গুঁফো বুড়ো জোয়াকিম, গাড়ির মেকানিক গুস্তাভ আর জাদুঘরের ভাগনারও ছিল। স্বপনের বাবা মা বসেছিলেন ঘরের এক কোণে। তাঁদের ছেলেমেয়েরা রাতারাতি হয়ে উঠেছে দারুণ এক ঘটনার মধ্যমণি। স্বপনের বাবা বললেন, 'ছেলেমেয়েদের জন্য তোমার নিশ্চয় গর্ব হচ্ছে ইভা।'

'কেন হবে না!' গর্বিত গলায় ইভা বললেন, 'নাৎসিরা আমার বাবা মাকে হত্যা করেছিল। আমার ছেলেমেয়েরা নব্য নাৎসিদের একটা ঘাঁটি ধ্বংস করে দিয়েছে।'

'আমার কী মনে হচ্ছে জানো?'

'কী মনে হচ্ছে?'

'দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য একদিন রাজনীতি করতে নেমেছিলাম। টিকতে না পেরে দেশ থেকে পালিয়েছি। এত বছর একধরনের অপরাধবোধে ভুগছিলাম। আজ মনে হচ্ছে আমি যা পারিনি আমার ছেলেমেয়েরা তা পারবে।'

বাইরে আকাশে তখন পূর্ণিমার চাঁদ বাভারিয়ার পাহাড় আর বনে জ্যোৎস্নার ঢল নামিয়ে দিয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে বহু বছর দেশছাড়া শফিক খানের মনে হলো, এতকাল নিজেকে একা ভেবে ভয় পেয়েছেন, কষ্ট পেয়েছেন। এবার তিনি নির্ভয়ে দেশে ফিরে যেতে পারবেন।